সুগন্ধি বা সুগন্ধময় কাপড় এহরামকালে ব্যবহার করিবে না কিম্বা ধৌত করিয়া লইবে, যেন সুগন্ধ না থাকে

৮০১। হাদীছ ঃ—জাফওয়ান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা ইয়া'লা (রাঃ) ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি অহী নাযেল হওয়াকালীন তাঁহার অবস্থা আমাকে দেখাইবেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) "জেয়ে'ররাণা" (মক্কা নগরী হইতে ১১/১২ মাইল দূরে অবস্থিত) স্থানে থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। লোকটির পরিধানে একটি জুব্বা ছিল এবং উহা খালুক—জাফরান মিশ্রিত তৈরী সুগন্ধি মাখানো ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! ওমরার এহরাম অবস্থায় সুগন্ধি মাখানো জামা গায়ে থাকিলে কি করিতে হইবে? এবং আমি ওমরা কিরূপে আদায় করিব? রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নীরব রহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হুযরতের প্রতি অহী নাযেল হওয়া আরম্ভ হইল এবং তাঁহাকে একটি চাদর দ্বারা ঘেরাও করিয়া দেওয়া হইল। তখন ওমর (রাঃ) ইয়া'লা (রাঃ)কে তাঁহার পূর্ব অনুরোধ অনুসারে ইশারা করিয়া ডাকিলেন। তিনি আসিয়া ঐ ঘেরাও-এর ভিতর মাথা ঢুকাইয়া দেখিতে পাইলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ এবং তাঁহার কণ্ঠনালী হইতে একপ্রকার শব্দ নির্গত হইতেছে। কিছুক্ষণ পর যখন তাঁহার ঐ অবস্থা দূরীভূত হইল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ওমরার বিষয় প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? তখন এ ব্যক্তিকে সংবাদ দিয়া উপস্থিত করা হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমার পরিধানের জুব্বাটি খুলিয়া ফেল, (কারণ এহরাম অবস্থায় তৈরী জামা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ; তদুপরি ইহা সুগন্ধ যুক্তও বটে।) এবং (এই জাফরান মিশ্রিত) সুগন্ধ (তোমার জুব্বাটি হইতে) তিনবার ধৌত করিয়া ফেল। (কারণ, জাফরানের রং পুরুষের জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।) আর হজ্জ অবস্থায় যেরূপ চলিয়া থাক ওমরা অবস্থায়ও তদ্রূপই চল।

এহরামের পূর্বক্ষণে (শরীরে) সুগন্ধি ব্যবহার করা

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, এহরাম অবস্থায় ফুল শোঁকিতে পারে,* আয়নায় চেহারা দেখিতে পারে। যে সব বস্তু মূল সুগন্ধি নহে, বরং উহা মূলতঃ অন্য ব্যবহারের; যথা—আহার্য্য বস্তু; যেমন তৈল, ঘি এরূপ সুগন্ধময় বস্তু শরীরে ঔষধরূপে ব্যবহার করিলে কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না। আর যাহা মূলতঃ সুগন্ধি যেমন জাফরান, কস্তুরী ইত্যাদি উহা শরীরে প্রয়োজনে ঔষধরূপে ব্যবহারেও কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে (শামী, ২—২৭৭)।

---

* ফুল বা সুগন্ধি শুধু শোঁকিলে কাফ্ফারা দিতে হয় না, কিন্তু স্বেচ্ছায় তাহা করা মাকরূহ-তাহরিমী।

আ'তা (রাঃ) বলিয়াছেন, এহরাম অবস্থায় অঙ্গুরি ব্যবহার করিতে পারে এবং টাকা পয়সা রাখিবার জন্য "জালি" নামে যে লম্বা থলিয়াবিশেষ কোমরে পেঁচাইয়া বাঁধা হয়—উহাও এহরাম অবস্থায় কোমরে বাঁধিতে পারে।

মেহনত ও শক্তির কাজে শ্রমিকরা লুঙ্গির নীচে লেঙ্গট পড়িয়া থাকে।× আয়েশা (রাঃ) এরূপ ক্ষেত্রে এহরাম অবস্থায় সেই লেঙ্গট পরা জায়েয বলিয়াছেন।

৮০২। হাদীছ ঃ— সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইব্রাহীম (রঃ)কে বলিলাম—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এহরামের প্রস্তুতিকালে (শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয মনে করিতেন না, যেহেতু তাহা করিলে এহরামের পরেও সুগন্ধ বিদ্যমান থাকিবে, অতএব তিনি ঐ সময়) সুগন্ধবিহীন সাধারণ তৈল ব্যবহার করিতেন। ইব্রাহীম (রঃ) বলিয়াছেন, তুমি (সুস্পষ্ট হাদীছ বিদ্যমান থাকাবস্থায়) তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিবে কেন?

আসওয়াদ (রঃ) আমার নিকট আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে (এহরাম বাঁধার পূর্বক্ষণে আমি) তাঁহার মাথার আঁচড়ানো চুলের মধ্য রেখায় (সুগন্ধি লাগাইয়া দিয়া ছিলাম;) এহরাম অবস্থায় সেই সুগন্ধির উজ্জ্বল চিহ্ন আমি দেখিয়াছি; এখনও যেন উহা আমার চোখে ভাসে।

৮০৩। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিজ হস্তে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সুগন্ধি লাগাইয়া দিয়াছি:* এহরামের প্রস্তুতির সময় এবং এহরাম খোলার পর—তওয়াফে জেয়ারতের পূর্বে।

মাথায় বড় চুল থাকিলে এহরাম বাঁধিতে উহা জমাইয়া দিবে, যেন এলোমেলো না হইতে পারে

৮০৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তলবিয়া পড়িতে শুনিয়াছি; তখন তাঁহার মাথার চুল জমানো ছিল।

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর এহরাম স্থান

৮০৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিল-হোলায়ফার (পরবর্তীকালে নির্মিত তথাকার) মসজিদের নিকট হইতেই এহরাম বাঁধিয়াছিলেন।

× এক হয় "জাঙ্গিয়া" যাহা খাট হাফপেন্টের ন্যায় শরীরের গঠন ও আকৃতিতে তৈরী থাকে; উহা এহরাম অবস্থায় পরিধান করা জায়েয নহে। আর এক হয় লেঙ্গট, যাহা শরীরের কোন অংশের গঠন ও আকৃতিতে তৈরী নহে, বরং উহা কোন বিশেষ গঠনবিহীন শুধু লম্বা লেজবিশিষ্ট হয়; কোমরে পেঁচাইয়া উহা পরা হয়—যেমন কুস্তিগীররা পরিয়া থাকে। উহা এহরাম অবস্থায় পরিধান করা জায়েয আছে।

* শরীরে সুগন্ধি লাগাইবে, কিন্তু কাপড়ে লাগাইবে না, নতুবা ঐকাপড়ে এহরাম বাঁধিতে পারিবে না।

এহরাম অবস্থায় কি কি কাপড় পরিধান নিষিদ্ধ

৮০৬। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! এহরামওয়ালা ব্যক্তি কি কি কাপড় ব্যবহার করিতে পারে? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এহরামওয়ালা (পুরুষ) ব্যক্তি কোন প্রকার জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি ইত্যাদি পরিধান করিতে পারিবে না। মোজাও ব্যবহার করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি জুতার ব্যবস্থা না থাকে তবে চামড়ার মোজা পায়ের মধ্যপৃষ্ঠের উঁচু স্থান এবং গোছের নিম্নে উভয় দিকের গিঁঠদ্বয় উন্মুক্ত থাকে এইরূপে উপরের অংশ কাটিয়া ফেলিয়া উহা (জুতার ন্যায়) ব্যবহার করিতে পারিবে। আর একটি বিষয় স্মরণ রাখিও যে, তোমরা কোন অবস্থাতেই 'অরস' (একপ্রকার উদ্ভিদ জাতীয় রং করার বস্তু) বা জাফরানে রং করা কাপড় ব্যবহার করিও না।

হজ্জের কার্য্য সম্পাদনে যানবাহন ব্যবহার করা

৮০৭। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরফা হইতে মোজদালেফা আসাকালে উসামা (রাঃ)কে স্বীয় যানবাহনে বসাইয়া ছিলেন এবং মোজদালেফা হইতে মীনা আসাকালে ফজল (রাঃ)কে বসাইয়া ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জামরা আকাবার রমী করা (অর্থাৎ বড় শয়তানকে ১০ তারিখে কঙ্কর মারা) পর্য্যন্ত তলবিয়া পড়িয়াছেন।

এহরাম অবস্থায় পরিধেয়

- এহরাম অবস্থায় চাদর এবং লুঙ্গি* পরিধান করিবে।
- পুরুষ এহরাম অবস্থায় মাথা ঢাকিতে পারিবে না। মহিলার মাথা যেহেতু তাহার ছতরের অন্তর্ভুক্ত, তাই উহা অবশ্যই ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু মহিলাদের চেহারা যেহেতু ছতরের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাই এহরাম অবস্থায় উহাকে পরিধাক বিহীন রাখিতে

---

* এহরাম অবস্থায় সেলাই করা লুঙ্গিও পড়া জায়েয। কারণ এহরাম অবস্থায় যে, পুরুষের জন্য সেলাই করা কাপড় নিষিদ্ধ উহার উদ্দেশ্য যাহা শরীর বা অঙ্গের গঠন আকৃতিতে সেলাই করা হয়; যেমন—জামা, পায়জামা। লুঙ্গির শুধু দুই মাথা জুড়িয়া দেওয়া হয়, উহা শরীরের গঠন আকৃতির নহে। আমাদের দেশের হাজীগণ সেলাই বিহীন লুঙ্গি পরিতে যাইয়া বার বার করিয়া গোনাহ এবং অতি জঘন্য লজ্জাকর অবস্থায় পতিত হয়। কাপড়ের হিসাবের বেলায় লুঙ্গির হিসাব চার হাত ঠিক রাখিয়া সেলাই বিহীন পরে, ফলে চলা-ফেরায় এবং শয়নে বা সামান্য বাতাসেও ছতর খুলিয়া যাইতে থাকে যাহা হারাম করিয়া গোনাহ। এত বড় গোনাহ দিবারাত্র অসংখ্য বার সংঘটিতে হইতে থাকে; ইহার প্রতি লক্ষ্য করা কতই না আবশ্যক! সেলাই বিহীন লুঙ্গি পরিতে হইলে অন্ততঃ পাঁচ হাত এবং মোটা শরীর হইলে ছয় হাত লম্বা লইবে, অন্যথায় লুঙ্গি সেলাই করা ব্যবহার করিবে।

হইবে ; এই কারণেই বোরকা পরিধান করিতে উহার নেকাব সাধারণভাবে চেহারার উপর পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় ছাড়িয়া দেওয়া বা শুধু চোখ খোলা রাখিয়া নাক-মুখ পর্যন্ত কাপড় জড়াইয়া দেওয়া এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। কিন্তু নারীদের জন্য বেগানা পুরুষ হইতে স্বীয় চেহারা পর্দায় রাখা ওয়াজেব, তাই নারীদেরকে এহরাম অবস্থায়ও বেগানা পুরুষদের সম্মুখে স্বীয় চেহারার পর্দা অবশ্যই করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে মাথার সঙ্গে কোন বস্তু রাখিয়া (যেমন ক্রিকেট খেলোওয়াড়দের ললাটের উপর থাকে) উহার উপর নির্দ্বিধায় বোরকার নেকাব ঝুলাইয়া দিতে পারে ; ইহাতে চেহারার পর্দা হইবে এবং যেহেতু নেকাব চেহারা হইতে আলগ থাকিবে, তাই উহা পরিধেয় গণ্য হয় না ; এহরাম অবস্থায় ঐরূপ ব্যবহার জায়েয। (বেগানাদের সম্মুখে চেহারার পর্দা করা এহরাম অবস্থায় নারীদের জন্য ওয়াজেব (শামী, ২—২৬০)

● আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, মহিলারা এহরাম অবস্থায় অলঙ্কার পরিধান করিতে পারে, মোজা পরিতে পারে।

● নারী-পুরুষ কেহই সুগন্ধ বস্তুর দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করিতে পারিবে না, অবশ্য যদি সেই কাপড় হইতে সুবাস সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া গিয়া থাকে তবে উহা পরা জায়েয।

● কাল, গোলাবী ইত্যাদি সাধারণ যে কোন রঙ্গের রঙ্গীন কাপড় নারী-পুরুষ সকলেই এহরাম অবস্থায় বিনা দ্বিধায় পরিতে পারে ; তাহাতে দোষ নাই।+

● ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, এহরাম অবস্থায় পরিধেয় কাপড় বদলাইতে পারিবে ; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিবে।

৮০৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) মদীনা হইতে যাত্রা করিয়াছেন মাথা আঁচড়াইয়া তৈল ব্যবহার করিয়া (—পারিপাট্টের সহিত)। তাঁহার পরিধানে লুঙ্গি ও চাদর ছিল। নবী (দঃ) এবং তাঁহার ছাহাবীগণ এই পোশাকেই ছিলেন। এবং কোন প্রকার চাদর ও লুঙ্গি পরিধানেই নিষেধ করেন নাই ; অবশ্য জাফরান (ইত্যাদি সুগন্ধ বস্তুর) রঙ্গে

+ আমাদের দেশের হাজীগণ সাদা কাপড় পরে, কিন্তু লজ্জা-শরমের কোনই ধার ধারে না। অনেকে কম মূল্যের শিথিল বুননের কাপড় পরে, এহরাম অবস্থায় গায়ে জামা থাকে না, তাই শুধু ঐ কাপড়ে নির্লজ্জতার ছায়া সর্বদাই প্রকাশ পাইতে থাকে এতদ্ভিন্ন সাদা কাপড় পরিয়াই সকলে বিশেষতঃ জাহাজের মধ্যে এক সঙ্গে গোসল করিতে থাকে। সাদা কাপড় ভিজিলে কিরূপ জঘন্য দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তাহা সহজেই অনুমেয় এবং অপেক্ষমান লোক সমাবেশের সম্মুখে ঐ দৃশ্যে দাঁড়াইয়া গোসল করিতে থাকে—এ সব আমার চোখের দেখা অবস্থাবলী। হজ্জের ছফর অত্যন্ত পাক-পবিত্র ছফর ; এ সময় সংযত থাকা অধিক প্রয়োজন! গোসলের জন্য একটি রঙ্গিন কাপড় অবশ্য রাখিবে। এহরাম অবস্থায় সাদা কাপড় উত্তম বটে, কিন্তু ভাল বাইনের কাপড় সংগ্রহ করিতে না পারিলে রঙ্গিন কাপড় পরিবে।

রঞ্জিত কাপড়—যদি উহার রং শরীরে লাগে তবে (অবশ্যই উহার সুবাস তখন কাপড়ে বিদ্যমান থাকিবে, তাই ঐ অবস্থায়) উহা নিষিদ্ধ। নবী (দঃ) (জোহর নামাযান্তে মদীনা হইতে যাত্রা করিয়া) জুলহোলায়ফা নামক স্থানে (পৌঁছিয়া আছর নামায পড়িলেন এবং তথায়ই রাত্রি যাপন করিয়া) প্রভাত করিলেন। (এবং তথায়ই দিনের বেলায় - ফতহুলবারী, ৩—৩২২) এহরাম বাঁধিলেন।) তথা হইতে যাত্রা আরম্ভে তিনি উটে আরোহণ করিলেন এবং সংলগ্ন ময়দানে পৌঁছিলে নবী (দঃ) ও ছাহাবীগণ সজোরে তলবিয়া পড়িলেন এবং নবী (দঃ) নিজ সঙ্গের কোরবানীর পশুগুলির গলায় (কোরবানীর নিদর্শনস্বরূপে) মালা পরাইয়া দিলেন। তখন জিলকদ চাঁদের পাঁচ দিন বাকি ছিল। জিলহজ্জ চাঁদের চার তারিখ (শনিবার দিন ভোরের দিকে) হযরত (দঃ) মক্কায় পৌঁছিলেন; প্রথমেই বাইতুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফ করিলেন এবং ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করিলেন। নবী (দঃ) এহরাম অক্ষুণ্ণ রাখিলেন যেহেতু তাঁহার সঙ্গে কোরবানীর পশু নিয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর নবী (দঃ) "হাজুন" মহল্লায় অবস্থান করিলেন। তিনি হজ্জের এহরাম অবস্থায়ই ছিলেন। আরফা হইতে প্রত্যাবর্তনের (তথা জিলহজ্জের ১০ তারিখের) পূর্বে নবী (দঃ) আর তওয়াফ করিতে বাইতুল্লাহ্ শরীফের নিকটে আসেন নাই। ছাহাবীদিগকে কিন্তু তওয়াফ ও ছায়ী করার পরই মাথার চুল কাটিয়া এহরাম ভঙ্গ করার নির্দেশ দিলেন। এমনকি যাহার সঙ্গে স্ত্রী ছিল স্ত্রী ব্যবহার হালাল হইল এবং সুগন্ধি ও জামা-কাপড় ইত্যাদি সবই ব্যবহার করা হালাল হইয়া গেল। এই নির্দেশ শুধু তাহাদের জন্য ছিল যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল না।

ব্যাখ্যাঃ—যাঁহারা তওয়াফ ও ছায়ী করতঃ চুল কাটিয়া হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করিয়াছিলেন তাঁহাদের উক্ত তওয়াফ ও ছায়ী ওমরা পরিগণিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা জিলহজ্জের আট তারিখে পুনঃ হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া মিনায় যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পূর্ণ হজ্জ সমাপন করিয়াছিলেন।

হজ্জের এহরাম ভঙ্গ প্রসংগটি সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী; শুধু ঐ এক বৎসরই বিশেষ কারণাধীন রসুলের আদেশে হইয়াছিল। এবং তাহাদিগকে কোন কাফ্ফারা দিতে হয় নাই। আমাদিগকে সাধারণ নিয়মই পালন করিতে হইবে; যে কোন কারণে হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করিলে তাহাকে এহরাম ভঙ্গের কাফ্ফারা অবশ্যই আদায় করিতে হইবে।

এহরাম বাঁধার সময় তল্বিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলা

৮০৯। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায় হজ্জে যাত্রাকালে) মদীনা শহরে জোহরের নামায পূর্ণ চারি রাকাত আদায় করিয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং জুলহোলায়ফার এলাকায় পৌঁছিয়া আছরের নামায দুই রাকাত কছর পড়িলেন। পরদিন ঐ এলাকায় যখন এহরাম বাঁধিলেন তখন

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে উচ্চৈঃস্বরে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের নামে তল্‌বিয়া পড়িতে শুনিয়াছি।

তল্‌বিয়া

৮১০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তল্‌বিয়া এইরূপ ছিল—

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ـ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ اِنَّ الْحَمْدَ

وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ـ لَا شَرِيْكَ لَكَ ـ

অর্থ—গোলাম উপস্থিত হইয়াছে, হে আল্লাহ! গোলাম উপস্থিত হইয়াছে। গোলাম উপস্থিত হইয়াছে; তুমিই একমাত্র প্রভু, তোমার কোন শরীক নাই। গোলাম উপস্থিত হইয়াছে; সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য; যত নেয়ামতরাশি উপভোগ করিতেছি সবই তোমার এবং সারা বিশ্বের একচ্ছত্র রাজত্ব তোমার। তোমার কোনও শরীক নাই।

৮১১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় আমি জ্ঞাত আছি, ওমরও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তল্‌বিয়া কিরূপ পড়িতেন—

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা। লাব্বাইকা লা-শরীকা-লাকা লাব্বাইকা।

ইন্নাল্-হাম্‌দা ওয়ান্-নে'মাতা লাকা' (ওয়াল্-মুল্‌কা লাকা। লা-শরীকা-লাকা*)।

মছআলাহ ঃ—এহরাম বাঁধা হইতে আরম্ভ করিয়া দশ তারিখ সকাল বেলায় জমরা-আকাবাহ তথা বড় শয়তানকে কঙ্কর মারার পূর্ব পর্যন্ত এই তল্‌বিয়া সমস্ত পড়িয়া যাইবে। (১৩১ পৃঃ ৮০৭ হাদীছ)

এহরাম বাঁধিবার সময় আল্লার প্রশংসা করা তছবীহ পড়া এবং তকবীর বলা

৮১২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায় হজ্জে যাত্রার প্রাক্কালে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া জোহরের নামায মদীনাতে পূর্ণ চারি রাকাত পড়িলেন এবং জুল-হোলায়ফা এলাকায় আছরের নামায কছর দুই রাকাত পড়িলেন এবং সেই এলাকায়ই রাত্রি যাপন করিলেন। ভোর হইলে পর (দিনের বেলা) তিনি যানবাহনের উপর আরোহণ করিলেন। যানবাহন যখন তাঁহাকে লইয়া "বায়দা" নামক ময়দানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিলেন—

---

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বাক্য এই হাদীছে উল্লেখ নাই; ইহা সংক্ষিপ্ত তল্‌বিয়া প্রথমোক্ত হাদীছে এই বাক্যও আছে, উহা পূর্ণ তল্‌বিয়া।

"ছোবহানাল্লাহ" বলিয়া আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বয়ান করতঃ আল্লাহু আকবার বলিয়া আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব প্রকাশ করিলেন। অতঃপর হজ্জ ও ওমরা উভয়ের এহরাম বাঁধিলেন, (আমার নিকটস্থ) অন্যান্য সকলেও ঐ উভয়ের এহরামই বাঁধিল।

কেবলামুখী হইয়া এহরাম বাঁধা

৮১৩। **হাদীছ ঃ—** আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এরূপ অভ্যস্ত ছিলেন যে, হজ্জের জন্য যাত্রাকালে জুল-হোলায়ফা নামক স্থানে ফজরের নামায শেষ করিয়া যানবাহন প্রস্তুত করার আদেশ করিতেন। অতঃপর উহার উপর আরোহণ করিতেন। যানবাহন যখন তাহাকে লইয়া দাঁড়াইত তখন তিনি কেবলামুখী হইয়া তল্‌বিয়া পড়িতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ করিয়াছেন।

হায়েজ ও নেফাছ অবস্থায় এহরাম বাঁধা যায়

৮১৪। **হাদীছ ঃ—** আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায় হজ্জকালে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আমরাও ছিলাম। মিকাত হইতে আমি শুধু ওমরার এহরাম বাঁধিয়া ছিলাম। (মক্কা হইতে ১০/১২ মাইল দূরে) সারেফ নামক জায়গায় পৌঁছিয়া নবী (দঃ) সাথীগণকে নির্দেশ দিলেন, যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু রহিয়াছে তাহারা (শুধু ওমরার এহরামে থাকিলে) ওমরার সঙ্গে হজ্জের এহরামও বাঁধিয়া নিবে এবং হজ্জ সমাপ্তে উভয় এহরাম হইতে এহরাম মুক্ত হইবে। যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু নাই (হজ্জের এহরাম থাকিলেও) তাহারা এহরামকে কার্য্যতঃ ওমরার উপরই ক্ষান্ত করিবে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মক্কায় পৌঁছিয়া আমি হায়েজে লিপ্ত হইয়া পড়িলাম ; (আমার ওমরার কার্য্যাবলী হইল না ;) বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করিতে পারিলাম না, তাই ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করিতে পারিলাম না। নবী (দঃ) আমার নিকট তশরীফ আনিলেন— আমি কাঁদিতে ছিলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, হে বোকা! কাঁদ কেন! আমি বলিলাম আমি ত ওমরা আদায় করিতে অপারগ রহিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, নামায না পড়ার অবস্থা আমার হইয়াছে। নবী (দঃ) বলিলেন তোমার কোন ক্ষতি হইবে না ; তুমি আদম জাতেরই একজন মহিলা ; আদম-জাত সকল মহিলাদের উপর যাহা আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তোমার উপরও তাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। নবী (দঃ) বলিলেন, মাথার চুল খুলিয়া ফেল, মাথা আঁচড়াইয়া নেও (অর্থাৎ ওমরার এহরাম ভাঙ্গিয়া ফেল) ও ওমরা ছাড়িয়া দাও এবং হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া নেও : হাজীদের সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাও, শুধু বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ পবিত্রতা লাভের পূর্বে করিও না। আমি তাহাই করিলাম। আমার হায়েজ অবস্থা আরফার দিন পর্য্যন্ত থাকিল ; আরফা হইতে মিনায় আসিয়া আমি পাক হইলাম।

তখন মিনা হইতে আসিয়া হজ্জের ফরজ তওয়াফ করিয়া গেলাম। মিনায় অবস্থানের দিনগুলি পূর্ণ করিয়া ১৩ই জিলহজ্জ বিদায় তওয়াফের জন্য হযরত (দঃ) মিনা হইতে যাত্রা করিলেন আমিও তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিলাম। মোহাছ্ছাব নামক জায়গায় হযরত (দঃ) অবতরণ করিলেন, আমরাও অবতরণ করিলাম। তথায় রাত্রে আমি আরজ করিলাম, সকলে ওমরা ও হজ্জ উভয়টি লইয়া বাড়ী যাইবে, আর আমি শুধু হজ্জ লইয়া যাইব! তখন হযরত (দঃ) আমার ভ্রাতা আবদুর রহমানকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার ভগ্নিকে নিয়া হরম সীমার বাহিরে তানয়ীমে যাও। সে তথা হইতে ওমরার এহরাম বাঁধিবে। তারপর তোমরা ওমরার কার্য্যাবলী সমাপ্ত করিয়া এ-স্থানেই আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে; আমি তোমাদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিব। সেমতে ভ্রাতার সঙ্গে আমি বাহির হইলাম; তওয়াফ-ছায়ী করিয়া ওমরা সমাপ্ত করিয়া (চুল কর্তনে এহরাম খুলিয়া) শেষ রাত্রে হযরতের নিকট পৌঁছিলাম; তিনি তখন বিদায় তওয়াফ করিয়া ফিরিয়াছেন মাত্র। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ওমরা সমাপ্ত করিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার এই ওমরা তোমার পরিত্যক্ত ওমরার স্থলে হইল। অতঃপর হযরত (দঃ) সকলকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন; সকলে মদীনা পানে যাত্রা করিল।

অন্যের এহরাম দ্বারা নিজের এহরাম নির্দ্ধারণ

হজ্জ তিন প্রকার—এফরাদ, কেরাণ ও তামত্তো'। বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে। এফরাদ হইলে এহরাম বাঁধিবার সীমানা হইতে শুধু হজ্জের নিয়্যত করিতে এবং শুধু উহারই এহরাম বাঁধিতে হয়। তামাত্তো' হইলে সেই সীমানা হইতে শুধু ওমরার নিয়্যত ও এহরাম বাঁধিতে হয়। কেরাণ হইলে হজ্জ ও ওমরা একত্রে উভয়ের নিয়্যত ও এহরাম বাঁধিতে হয়। নিয়্যত ও এহরাম বাঁধার সময় উক্ত তিন প্রকারের একটি নির্দ্ধারণ করে যদি এরূপ বলে যে, আমি অমুক ব্যক্তির এহরামের ন্যায় এহরাম বাঁধিলাম, তবে তাহার নিয়্যত ও এহরাম শুদ্ধ গণ্য হইবে এবং কার্য্য আদায় আরম্ভ পর্য্যন্ত উক্ত ব্যক্তির এহরাম কোন্ প্রকারের তাহা জানিতে পারিলে তাহার এহরাম ঐ প্রকারেরই সাব্যস্ত হইবে; সে ঐ অনুপাতেই আমল করিবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তির এহরামের খোঁজ না পায় তবুও তাহার মূল এহরাম শুদ্ধ হইবে, কার্য্যারম্ভে তাহাকে উক্ত তিন প্রকারের কোন এক প্রকার নির্দ্ধারিত করিয়া লইতে হইবে এবং সেই অনুপাতে কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। শামী, ২—২১৭

৮১৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায় হজ্জ উপলক্ষে হজ্জের এহরামের সহিত মক্কাভীমুখে চলিলেন, আমরাও তাঁহার সহিত এহরাম বাঁধিয়া চলিলাম। মক্কায় পৌঁছিয়া হযরত নবী (দঃ) সকলকে তাকিদ দিলেন যে, যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু আনা হয় নাই তাহারা নিজ

নিজ এহরাম ওমরায় পরিণত করিয়া ফেল। (অর্থাৎ তাহারা ওমরার কার্য্য সমাধা করিয়া এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেলিবে।) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল।

আলী (রাঃ) ইয়ামানে ছিলেন, তথা হইতে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকার হজ্জের এহরাম বাঁধিয়াছ? তোমার স্ত্রী (ফাতেমা রাঃ) আমার সঙ্গে আসিয়াছে। আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি এহরাম বাঁধিতে এইরূপ বলিয়াছি—নবী (দঃ) যে প্রকার হজ্জের এহরাম বাঁধিয়াছেন আমারও তাহাই। নবী (দঃ) বলিলেন, তবে তুমি এহরাম অবস্থায়ই থাক; আমাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু আছে। ৬২৪ পৃঃ

৮১৬। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে ইয়ামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তথা হইতে তিনি মক্কায় পৌঁছিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকার হজ্জের এহরাম বাঁধিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি বলিয়াছি—

لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم

"রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হজ্জ অনুরূপ হজ্জের নিয়্যতে আমি তল্‌বিয়া পড়িতেছি।" নবী (দঃ) বলিলেন, তবে তুমি নিজ সঙ্গে কোরবানীর পশু অবলম্বনকারী পরিগণিত থাক; তথা এহরাম অবস্থায়ই থাক—যেরূপ আছ। জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, আলী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য কতিপয় কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিলেন এবং নবী (দঃ) তাঁহাকে কোরবানীর পশুর মধ্যে অংশীদার করিয়া নিয়াছিলেন। (৩৩১ ও ৬২৪ পৃঃ)

৮১৭। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) ইয়ামান হইতে মক্কায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পৌঁছিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকার এহরাম বাঁধিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি এরূপ বলিয়াছিলাম, যে প্রকার এহরাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের, আমারও তাহাই। নবী (দঃ) বলিলেন, আমার সঙ্গে কোরবানীর পশু না থাকিলে আমি এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেলিতাম।

৮১৮। হাদীছ ঃ— আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে আমার দেশ ইয়ামানে পাঠাইয়াছিলেন। (বিদায় হজ্জ উপলক্ষে) আমি তথা হইতে মক্কায় পৌঁছিলাম। নবী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ এহরাম বাঁধিয়াছে?

আমি আরজ করিলাম, আমি এরূপ বলিয়াছি—

"আমি তল্‌বিয়া পড়িতেছি এহরামের উদ্দেশ্যে—ঐরূপ এহরাম যেরূপ এহরাম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাঁধিয়াছেন"। নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সঙ্গে কোরবানীর পশু আছে কি? আমি বলিলাম, না। নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, কা'বা শরীফের তওয়াফ কর এবং ছাফা-মারওয়ার ছায়ী কর অতঃপর এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেল। আমি তাহাই করিলাম; তওয়াফ-ছায়ী করিয়া আমার বংশীয় এক মহিলার নিকট আসিলাম, সে আমার মাথা ধোয়ার ও আঁচড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল—আমি এহরাম ভঙ্গ করিলাম। (৬৩১ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—নবী (দঃ) বিদায় হজ্জে একশত উট কোরবানী করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৬৩টা নবী (দঃ) স্বয়ং মদীনা হইতে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিলেন, আর ৩৭টা আলী (রাঃ) ইয়ামান হইতে নিয়া আসিয়াছিলেন। উক্ত পশু জবেহ করার সময় স্বীয় বয়সের বৎসর সংখ্যায় ৬৩টি স্বয়ং নবী (দঃ) নিজ হাতে জবেহ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্টগুলি আলী (রাঃ)কে জবেহ করিতে দিয়াছিলেন। অতঃপর প্রতিটি উট হইতে সামান্য অংশ গোশত একত্র করতঃ উহা পাকাইয়া নবী (দঃ) ও আলী (রাঃ) উভয়ে তাহা আহার করিয়াছিলেন। এই সব তথ্য মোছলেম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে। সেমতে দেখা যায় আলী (রাঃ) কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিতেও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীক ছিলেন। উহা জবেহ করা এবং আহার করায়ও তাঁহার শরীক ছিলেন। তদুপরি ৮১৬নং হাদীছে ইহাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ হইয়াছে যে, নবী (দঃ) আলী (রাঃ)কে স্বীয় কোরবানীর পশুর মধ্যে শরীক বা অংশীদার করিয়া নিয়াছিলেন। সুতরাং আলী (রাঃ) কোরবানী পশু সঙ্গে অবলম্বনকারী পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাই এহরাম ভঙ্গের নির্দেশ তাঁহার প্রতি হয় নাই; তাঁহার জন্য এহরাম অবস্থায় থাকারই নির্দেশ ছিল যেরূপ নবী (দঃ) ছিলেন। জাহাবী আবু মুছার অবস্থা তদ্রূপ ছিল না, তিনি কোরবানীর পশু সঙ্গে অবলম্বনকারী ছিলেন না, তাই সকলের ন্যায় তাঁহাকে এহরাম ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল। কারণ, ঐ বৎসর কোরবানীর পশু সঙ্গে থাকা না থাকার উপরই এহরাম রাখা বা ভঙ্গ করা আরোপিত ছিল।

হজ্জের সময়

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ -

অর্থ—হজ্জ (তথা হজ্জের এহরাম) সম্পাদন করার জন্য একাধিক নির্দিষ্ট মাস আছে। যে ব্যক্তি ঐ মাসের মধ্যে হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া নেয় তাহার অবশ্য কর্তব্য হইবে, সে যেন হজ্জ তথা এহরাম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী সুলভ ব্যবহারের তথা মুখে উচ্চারণও না করে এবং কোন

প্রকার শরীয়ত বিরোধী কার্য্য না করে এবং কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়। (যদিও হজ্জের বিশিষ্ট কার্য্যসমূহ জিলহজ্জ মাসের ৫।৬ দিনে মাত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তথাপি যখন এহরাম বাঁধা হইয়াছে তখন হইতেই সে হজ্জের মধ্যে পরিগণিত হইবে)। (২ পাঃ ৯ রুঃ)
আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

অর্থ—কাফেররা আপনাকে (বিব্রত করার জন্য) জিজ্ঞাসা করে প্রতি মাসেই চন্দ্রের মধ্যে (ছোট বড় হওয়ার বিরাট) পরিবর্তন কেন হইয়া থাকে? আপনি বলিয়া দিন, এই পরিবর্তনের দ্বারা (মাস সৃষ্টি হইয়া থাকে; মাসের দ্বারাই) বিশ্ববাসী তাহাদের ক্রিয়া কার্য্যসমূহের হিসাব স্থির করিয়া থাকে এবং হজ্জের সময়ও উহার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়।
(২ পারা ৮ রুকু)

● আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, হজ্জের মাস এই—শাওয়াল, জুলকাদাহ এবং জুল-হেজ্জার প্রথম দশ দিন।

● আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছুন্নত তরিকা এই যে, হজ্জের মাসের পূর্বে এহরাম বাঁধিবে না।

● ওসমান (রাঃ) এহরামের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ন্যায় নির্দিষ্ট স্থানের প্রতিও লক্ষ্য রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট মীকাতের পূর্বে অন্য স্থান হইতে এহরাম বাঁধা মকরূহ বলিয়াছেন।

হজ্জের প্রকার

হজ্জ তিন প্রকার—(১) হজ্জে এফ্‌রাদ, (২) হজ্জে কেরাণ, (৩) হজ্জে তামাত্তো'। নিয়্যত করা তথা এহরাম বাঁধার সময় শুধু হজ্জেরই এহরাম বাঁধা এবং শেষ পর্য্যন্ত শুধু হজ্জের কার্য্যাবলী সমাপন করা উহাকে হজ্জে-এফ্‌রাদ বলে।

নিয়্যত করা ও এহরাম বাঁধার সময়েই হজ্জ ও ওমরা উভয়ের নিয়্যত ও এহরাম একত্রে হইলে, কিম্বা প্রথমে হজ্জ বা ওমরা একটির নিয়্যত ও এহরাম বাঁধিয়া উহার কার্য্য আরম্ভের পূর্বে যে কোন সময় এমনকি মক্কায় পৌঁছিয়াও অপরটির নিয়্যত সঙ্গে করিয়া নিলে উহাকে হজ্জে-কেরাণ বলা হয়। ইহার জন্য অতিরিক্ত কাজ হইল—হজ্জের ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত তওয়াফ ছাড়া অতিরিক্ত ওমরার নিয়্যতে সাত চক্কর তওয়াফ করা এবং হজ্জের ওয়াজেব ছাফা-মারওয়ার সায়ী ছাড়াও অতিরিক্ত ওমরার নিয়্যতে সায়ী করা, আর ১০ই জিলহজ্জ নিয়মিত কোরবানী ছাড়া হজ্জে-কেরাণের নিয়্যতে কোরবানী করা। আরও প্রকাশ থাকে যে, হজ্জে কেরাণকারী ওমরা ও হজ্জ উভয়ের এহরাম এক সঙ্গে রাখিয়াছে, তাই হজ্জ সমাপ্তির পূর্বে ওমরার তওয়াফ ও ছায়ী করার পরও এহরাম অবস্থায় থাকিবে।

আর প্রথম হইতে শুধু ওমর'র এহরাম বাঁধিয়া মক্কায় পৌছিয়া হজ্জের নির্ধারিত মাস সমূহের মধ্যে ওমরার নিয়্যতে তওয়াফ, ছায়ী করার পরে হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া হজ্জের দিন সমূহে হজ্জ সমাপনা করা হইলে উহাকে হজ্জে-তামাত্তো' বলা হয়। প্রকাশ থাকে যে, হজ্জে-তামাত্তো'তে যেহেতু ওমরার এহরামের সঙ্গে হজ্জের এহরাম থাকে না, তাই ওমরার কার্য্যাবলী তথা তওয়াফ ও ছায়ী করিয়াই (সাধারণ অবস্থায়) চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিয়া নিবে এবং ৮ই জিলহজ্জ মিনায় যাত্রার পূর্বে হজ্জের এহরাম বাঁধা পর্য্যন্ত এহরাম বিহীনই থাকিবে। হজ্জে-কেরাণের ন্যায় এক্ষেত্রেও হজ্জে-তামাত্তো'র নিয়্যতে কোরবানী করিতে হইবে। হজ্জে-কেরাণ ও হজ্জেতামাত্তোর মধ্যে পার্থক্য দুইটি--(১) হজ্জে-কেরাণ হজ্জ ও ওমরা উভয়ের নিয়্যত প্রথম হইতে বা কার্য্য আরম্ভের পূর্বে একত্রিত হয়, পক্ষান্তরে হজ্জে-তামাত্তো'তে প্রথম হইতে শুধু ওমরার নিয়্যত করা হয়; ওমরা শেষ করিয়া তারপর হজ্জের এহরাম ও নিয়্যত করা হয়। (২) হজ্জে-কেরাণে এহরাম বাঁধিবার পর মধ্যভাগে এহরাম খোলার কোন ব্যবস্থা নাই, হজ্জ সমাপ্তেই এহরাম খুলিবে, তাই ইহাতে দীর্ঘ দিন এহরাম অবস্থায় থাকিতে হয় যাহা একটি এবাদৎ এবং কষ্টসাধ্য হওয়ায় অধিক ছওয়াবের আমল। পক্ষান্তরে হজ্জে-তামাত্তো'তে মক্কায় পৌছিয়া ওমরার তওয়াফ, ছায়ী করতঃ চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিয়া ফেলা হয়, পুনরায় ৮ই জিলহজ্জে দুই দিনের জন্য এহরাম বাঁধিতে হয়—ইহাই সাধারণ তামাত্তো-এর নিয়ম।

অধিক এবং সাব্যস্ত রকমের প্রমাণ অনুসারে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায় হজ্জ, হজ্জে-কেরাণ ছিল। হানফী মজহাব মতে হজ্জে-কেরাণই সর্বোত্তম কিন্তু হজ্জের তারিখের অধিক পূর্বে এহরাম বাঁধা হইলে সে ক্ষেত্রে হজ্জে-কেরাণ এবং হজ্জে-এফরাদও সঙ্কটাপূর্ণ ও ভয় সঙ্কুল; এমতাবস্থায় হজ্জে-তামাত্তো' করাই কর্তব্য, ইহা হজ্জে-এফরাদ হইতে উত্তমও বটে।

৮১৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অন্ধকার যুগে আরবের লোকদের আকিদা ও বিশ্বাস এরূপ ছিল যে, হজ্জের মাস সমূহের × যে কোন দিনে ওমরা

× হজ্জের মাস সমূহ হইল—শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ্জের দশ তারিখ পর্য্যন্ত। হজ্জের মূল কার্য্য--আরাফায় অবস্থান শুধু নয় তারিখেই নির্দ্ধারিত; অপর মূল কার্য্য তথা হজ্জের ফরজ নিয়্যতে তওয়াফ, ইহার জন্য নিয়মিত সময় দশ তারিখ শুধু সহজ করার উদ্দেশ্যে; ইহা পরে করিলেও জায়েয হয়। এতদসত্ত্বেও হজ্জের মাস শাওয়াল হইতে ধরা হইয়াছে, কারণ মানুষ বহু দূর-দুরান্ত হইতে হজ্জ করিতে আসিবে; তাহাদের জন্য মক্কা হইতে বহু দূরে দূরে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন স্থান "মীকাতরূপে" শরীয়ত কর্তৃক নির্দ্ধারিত রহিয়াছে; তথা হইতে হজ্জকারীগণকে বাধ্যতা মূলক এহরাম বাধিয়া আসিতে হইবে। সেই এহরাম অবশ্যই হজ্জের মূল কার্য্য আদায়ের দিন

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

করা প্রত্যেকের জন্যই অতি বড় জঘন্য পাপ। তাহারা বলিত, হজ্জের দীর্ঘ সফরে সৃষ্ট উটের পৃষ্ঠের ঘা সুস্থ হওয়ার এবং শ্রান্তি দূর হওয়ার পর—জিলহজ্জ মাসের পরে আরও একমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর ওমরাকারীর জন্য ওমরা শুদ্ধ হইবে। উক্ত গর্হিত আকিদা চিরতরে খণ্ডন-উদ্দেশ্যে নবী (দঃ) বিদায় হজ্জ উপলক্ষে জিলহজ্জ মাসের চার তারিখের ভোরে মক্কায় পৌঁছিয়াই সকলকে তাকিদ দিলেন তাহাদের হজ্জের এহরামকে ওমরায় পরিণত করার জন্য।

হজ্জের দিন নিকটবর্তী অবস্থায় হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করিতে ছাহাবীদের মনে আতঙ্ক হইল; তাঁহারা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এহরাম ভঙ্গ কি রকমের হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, পূর্ণরূপে এহরাম ভঙ্গ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ— উল্লিখিত অন্ধকার যুগের আকিদাটি ইসলামী বিধানের পরিপন্থি ছিলই, অধিকন্তু উত্তম প্রকারের হজ্জ—হজ্জে-ক্বেরাণ ও হজ্জে-তামাত্তো' এরও অন্তরায় ছিল। মোসলমানগণ সঠিক বিধান ও মছআলাহ সাধারণভাবে জ্ঞাত ছিল; বিদায় হজ্জ যাহা হজ্জের মাসেই ছিল—ঐ সময় হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আরও অনেকে হজ্জের সহিত ওমরার নিয়্যত করিয়াছিলেন, অনেকে শুধু ওমরার এহরাম বাঁধিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত ভ্রান্ত আকিদাটি এত দৃঢ় এবং ব্যাপক ভাবে প্রচারিত ছিল যে, উহা খণ্ডনের জন্য নবী (দঃ) উহার বিপরীত বিরাট আলোড়ন সৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নবী (দঃ) তাঁহার লক্ষাধিক সঙ্গীদের মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল তাঁহারা ছাড়া ব্যাপকভাবে সকলকে নিজ নিজ হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করতঃ ওমরায় পরিণত করার আদেশ করিলেন। মক্কা হইতে ৯।১০ মাইল ব্যবধানে "সারেফ" নামক মঞ্জিলে অবতরণ করিয়া নবী (দঃ) এই আদেশ জারী করেন এবং মক্কায় পৌঁছিয়া উহার প্রতি পুনঃ পুনঃ তাকিদ দেন; উহাতে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় যাহার বিবরণ পরবর্তী হাদীছে আসিতেছে। শেষ পর্যন্ত লক্ষ লোকের হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করতঃ ওমরায় পরিণত করিয়া হজ্জের মাসে ওমরা করার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ঐ সব লোকের হজ্জ, হজ্জে-তামাত্তো' রূপে আদায় হয়। হজ্জের এহরাম

হইতে বহু পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে; কারণ এহরামের নির্দ্ধারিত স্থান তথা "মীক্বাত" সমূহ মক্কা হইতে বহু দূরে অবস্থিত। এহরাম হজ্জের সর্বপ্রথম কাজ—এই কাজটি যদি হজ্জের সময়ভুক্ত না হয় তবে তাহা অসুন্দর দেখাইবে, তাই এহরামের সাধারণ সম্ভাব্য সময়কে হজ্জের সময়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শাওয়াল মাস হইতে হজ্জের সময় গণ্য করা হইয়াছে। ইহা পূর্ব হইতেই প্রবর্তিত ছিল, এমনকি অন্ধকার যুগে কাফেরদের মধ্যেও ইহা প্রচলিত ছিল। কোরআন শরীফে ২ পাঃ ৯ রুকুতে যে উল্লেখ আছে—হজ্জের সময় হইল কতিপয় নির্দ্ধারিত মাস' উহার উদ্দেশ্যও এই যে, শরীয়ত কর্তৃক উক্ত মাস সমূহই হজ্জের কার্য্যাবলীর জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এইরূপে ভঙ্গ করিলে সাধারণ বিধান মতে কাফ্ফারা আদায় করিতে হয়, কিন্তু ঐ বৎসর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশে এহরাম ভঙ্গকারীরা উক্ত কাফ্ফারা হইতে রেহায়ী পায়।

৮২০। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জে আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। আমাদের প্রায় সকলেই হজ্জে-এফরাদের ছিল। আমরা "লাব্বাইকা বিল-হজ্জে" বলিয়া স্পষ্টরূপে হজ্জের উল্লেখ পূর্বক এহরাম বাঁধিয়া ছিলাম। আমাদের কাহারও সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল না—শুধুমাত্র নবী (দঃ) ও তাল্হা (রাঃ) (এবং আর কতিপয় নগণ্য সংখ্যক লোক) ছাড়া। আলী (রাঃ) ইয়ামান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গেও কোরবানীর পশু ছিল। (যাহাদের সঙ্গে পশু ছিল না তাহাদের) সকলকে নবী (দঃ) আদেশ করিলেন, তোমরা বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ায় সায়ী (তথা শুধু ওমরা) আদায় করিয়া চুল কর্তন পূর্বক হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেল, ৮ তারিখে পুনঃ হজ্জের এহরাম বাঁধিবে। এই ভাবে তোমরা যে, হজ্জের নিয়্যত করিয়া আসিয়াছ উহাকে হজ্জে-তামাত্তো'রূপে রূপান্তরিত কর। ছাহাবীগণ আরও করিলেন, আমরা বর্তমান এহরামকে ভাঙ্গিয়া হজ্জে তামাত্তো'-এর ওমরায় পরিণত করিব কিরূপে, অথচ আমরাত এহরাম বাঁধিবার সময় স্পষ্টরূপে হজ্জের এহরাম বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, আমি যাহা আদেশ করিয়াছি তাহা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য; আমি কোরবানীর পশু সঙ্গে না আনিলে আমিও তোমাদের ন্যায় এহরাম ভঙ্গ করিতাম। অনেকের মনে এরূপ সঙ্কোচেরও উদয় হইল যে, হজ্জ আরম্ভের দিন সম্মুখে আগত, আমরা এখন এহরাম ভঙ্গ করিয়া সাধারণভাবে স্ত্রীও ব্যবহার করিতে পারি—সেমতে স্ত্রী ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে হজ্জ সমাপনে মিনায় যাত্রা করিব; ইহা কিরূপ হইবে? এই সব ইতঃস্তুতার সংবাদ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোচরীভূত হইল। নবী (দঃ) ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি, অনেক এই, এই কথা বলিতেছে। আল্লার কসম—আমি নেক কাজকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভালবাসি এবং আল্লাহ তায়ালাকে বেশী ভয় করি। (ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডনের জন্য এহরাম ভঙ্গের) যে প্রয়োজনীয়তা আমি পরে অনুভব করিয়াছি তাহা পূর্বে অনুভব করিলে আমি কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিতাম না এবং আমার সঙ্গে ঐ পশু না থাকিলে অবশ্যই আমিও এহরাম ভঙ্গ করিতাম। অতঃপর আমরা সকলে আমাদের হজ্জের এহরাম ও নিয়্যতকে ওমরায় রূপান্তরিত করিয়া নিলাম। সোরাকাহ ইবনে মালেক (রাঃ) দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! ইহা (অর্থাৎ হজ্জের মাসে ওমরা করার বৈধতা) শুধু আমাদের উপস্থিতগণের জন্য, না—কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদার জন্য? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমাদের জন্যই নয় শুধু, বরং সর্বদার জন্য।

৮২১। **হাদীছ ঃ**—উম্মুল-মোমেনীন হাফছাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! লোকগণ (আপনার নির্দেশে) তাহাদের হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করিয়া ওমরায় রূপান্তরিত করিয়াছে, আপনি কি সেরূপ ওমরা করতঃ এহরাম ভঙ্গ করিবেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি এহরামকে স্থায়ী করার ব্যবস্থা করিয়া কোরবানীর নিদর্শনযুক্ত পশু সঙ্গে আনিয়াছি। সুতরাং কোরবানী না করা পর্যন্ত আমি এহরাম ছাড়িতে পারি না।

৮২২। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এক সঙ্গে হজ্জ ও ওমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, বিদায়-হজ্জ কালে আমরা সকলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এহরাম বাঁধিয়া চলিলাম; মক্কায় পৌঁছিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে তাকিদ দিলেন যে, তোমরা তোমাদের হজ্জের এহরামকে ওমরায় পরিণত করিয়া নেও—তাহারা ছাড়া যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিয়াছে। সেমতে আমরা তওয়াফ ও সায়ী করিয়া (এহরাম ভঙ্গ করতঃ) স্ত্রী ব্যবহার, জামা-কাপড় ব্যবহার করিলাম। যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিয়াছিল তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন, তাহারা (১০ তারিখে) কোরবানী না করিয়া এহরাম ছাড়িতে পারিবে না। অতঃপর ৮ই জিলহজ্জ তারিখে দুপুরের পর আমাদিগকে (এহরাম ভঙ্গকারীদিগকে) পুনঃ হজ্জের এহরাম বাঁধার আদেশ করিলেন।

অতঃপর আমরা হজ্জের কার্য্যাবলী সমাপ্ত করিলে আমাদের উপর একটি কোরবানী ওয়াজেব হইল যেরূপ কোরআনের আয়াতের নির্দেশ রহিয়াছে। এই সময় সকলে একই বৎসর এক সঙ্গে হজ্জ ও ওমরা উভয়টি আদায় করিল; ইহার বিধান আল্লাহ তায়ালা কোরআনে নাযেল করিয়াছেন এবং নবী (দঃ) উহার আদর্শ স্থাপন করিয়া লোকদের জন্য উহাকে বৈধ সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য ইহা মক্কাবাসী ভিন্ন অন্য লোকদের জন্যই বৈধ। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—"ইহা (তথা হজ্জ ও ওমরা এক সঙ্গে করা) শুধু মাত্র ঐ লোকদের জন্য যাহাদের পরিবারবর্গ মক্কা নিবাসী না হয়" (২ পাঃ ৮ রুঃ)।

মছআলাহ ঃ— যে প্রকার হজ্জের নিয়্যত ও এহরাম বাঁধা হয় এহরাম বাঁধাকালীন "লাব্বাইকা" পড়িতে উহার উল্লেখ করা উত্তম। যথা—হজ্জে এফরাদকারী বলিবে—

لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ . لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ..... (১০৩ পৃঃ ৮২০ হাদীছ)

এবং হজ্জে-তামাত্তো'কারী বলিবে—

لَبَّيْكَ بِالْعُمْرَةِ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ . لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ .....

এবং হজ্জে-কেরাণকারী বলিবে—

لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ..... (১৯ পৃঃ ৮০৯ হাদীছ)

মক্কা শরীফে প্রবেশের পূর্বে গোছল করা

৮২৩। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) (হরম শরীফের নিকটবর্তী আসার পূর্ব পর্য্যন্ত শুধু তল্‌বিয়া পড়িতেন, কিন্তু) হরম শরীফের নিকটবর্তী হইলে পর (শুধু) তল্‌বিয়া পড়িতেন না (বরং অন্যান্য দোয়া-দরূদ পড়ায়ও মশগুল হইতেন) এবং "জি-তুয়া" নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিতেন। তথায় ফজরের নামাজ আদায় করিতেন, অতঃপর গোসল করিতেন। তিনি বর্ণনা করিতেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ করিয়াছেন।

কোন্ পথে মক্কায় প্রবেশ করিবে

৮২৪। **হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা শরীফে ছানিয়াতুল-ও'ল্‌ইয়া—উর্দ্ধ প্রান্তের "কাদা" নামক পথে প্রবেশ করিয়াছিলনে এবং ছানিয়াতুছ-ছোফলা—নিম্ন প্রান্তের পথে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন।

বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ..... اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

অর্থ—এই বিষয় লক্ষ্য রাখিও যে, আমি বাইতুল্লাহ শরীফকে বিশ্ব-মানবের জন্য এবাদতের স্থান এবং শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। এবং এই আদেশ করিয়াছি যে, বিশেষরূপে মকামে-ইব্রাহীমের নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় কর। আর ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করিয়াছিলাম যে, আমার ঘরকে পাক-পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের জন্য, তথায় এবাদতরত অবস্থানকারীদের জন্য এবং নামায আদায়কারীদের জন্য। ইহাও স্মরণ রাখিও যে, ইব্রাহীম (আঃ) প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে পরওয়ারদেগার! এই শহরটিকে শান্তিময় ও নিরাপত্তার স্থান বানাইয়া দাও এবং শহরবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হয় তাহাদের জন্য ফল-ফলাদি ও খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়া দাও। (কারণ, ইহা এরূপ পাথরময় স্থান যে, উৎপাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম।) আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, (ইহজগতের জন্য আমার যে নীতি প্রচলিত আছে সেই নীতি অনুসারে) জাগতিক জীবনে কাফেরদের জন্যও আমি খাদ্য জোটাইব, কিন্তু পরকালে তাহাদিগকে অনিবার্য্যতঃ দোযখের আজাবে নিক্ষিপ্ত করিব; উহা অতিশয় কষ্টদায়ক জঘন্য স্থান। স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিত্তি স্থাপন ও দেয়াল প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন তখন তাঁহারা অতি নম্রতা ও কাকুতি-মিনতির সহিত এই

আরাধনা ও প্রার্থনা করিতেছিলেন—হে আমাদের পালনকর্তা প্রভু! তুমি আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল কর। তুমি আমাদের প্রার্থনা ইত্যাদি সব কিছু শ্রবণ করিয়া থাক এবং আমাদের অন্তরের এখলাছ—নিষ্কাম আগ্রহ-আকাঙ্খা সব কিছু জ্ঞাত আছ। হে প্রভু! আমরা—পিতা-পুত্রদ্বয়কে এবং আমাদের বংশধরকে তোমার দাস, তোমার একান্ত অনুগত আজ্ঞাবহ বানাও এবং তোমার এই ঘরের হজ্জের নিয়মাবলী শিক্ষা দান কর এবং আমাদের সমুদয় গোনাহ্-খাতা মাফ করিয়া আমাদের প্রতি রহম কর; তুমি নিশ্চয় তওবা কবুলকারী দয়ালু। (১ পারা ১৯ রুকু)

৮২৫। হাদীছ ঃ—*আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, হাতীমের স্থানটুকু× বাইতুল্লাহ শরীফের অংশ কি না? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—বাইতুল্লারই অংশ। আমি আরজ করিলাম, বাইতুল্লাহ শরীফ তৈয়ারীর সময় এই অংশকে উহার শামিল করা হয় নাই কেন? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তুমি জান না যে, তোমার বংশীয় কোরায়েশরা যখন এই বাইতুল্লাহ শরীফের পুনঃ নির্মাণের ইচ্ছা করিল, তখন (তাহারা এই পণ করিল যে, হারাম ও জুলুম অত্যাচার এবং জুয়া, লুট ও ডাকাতি ইত্যাদি অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ এই ঘর নির্মাণের কার্য্যে ব্যয় করিবে না। অথচ সেকালে তাহাদের অধিকাংশ উপার্জন ঐসব উপায়েই ছিল, অতএব) তাহাদের (হালাল) মাল সম্পূর্ণ ঘরের ব্যয় নির্বাহের পরিমাণ হইতে কম হইয়া গেল। (তাই তাহারা ঘরের প্রকৃত মাপ হইতে উত্তর দিকে কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়া ঘরটিকে ছোট আকারে নির্মাণ করিল এবং ঐ পরিত্যক্ত অংশটুকুই হইল হাতীম। আয়েশা (রাঃ) বলেন—) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাইতুল্লাহ শরীফের দরওয়াজা এত উপরে স্থাপিত হইয়াছে কেন? (যে, উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে প্রায় ৫।৬ হাত সিঁড়ির সাহায্যে উঠিতে হয়)। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমাদের বংশীয় লোকেরা এই উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়াছিল যেন বাইতুল্লাহ শরীফের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র তাহাদের হস্তে ন্যস্ত থাকে; যাহাকে ইচ্ছা করিবে প্রবেশ করিতে দিবে, আর যাহাকে ইচ্ছা করিবে বঞ্চিত রাখিবে।

অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের বংশীয় কোরায়েশরা যেহেতু সদ্য ইসলামী দলভুক্ত এবং সবেমাত্র অন্ধকার যুগের শৃঙ্খলমুক্ত নবাগত মোসলমান—তাই আমার আশঙ্কা হয় যে, বাইতুল্লাহ শরীফের ঘরের পরিবর্তন সাধন করিলে তাহাদের অন্তরে নানাপ্রকার সংশয়ের উদয় হইবে। (হয়ত তাহারা মনে করিবে, আল্লার রসুল হওয়ার দাবী করিয়া এখন আল্লার ঘর ভাঙ্গিয়া দিল।) নতুবা আমি নিশ্চয়

---

* এখানে আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত কতিপয় হাদীছ একত্রে অনুবাদ করা হইয়াছে।

× বাইতুল্লাহ শরীফ সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে ছোট দেয়ালে ঘেরাও করা স্থানকে হাতীম বলে।

বাইতুল্লাহ শরীফের পুনঃ নির্মাণ করিতাম এবং ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের নির্মিত পরিমাপ অনুযায়ী হাতীমস্থিত অংশও ঘরের মধ্যে শামিল করিয়া দিতাম এবং উহার দরওয়াজা নীচু করিয়া দিতাম (যেন সিঁড়ির সাহায্য ব্যতিরেকেই উহাতে প্রবেশ করা যায়)। এবং (বর্তমান অবস্থার—এক দরওয়াজাবিশিষ্ট না করিয়া) পশ্চিম দিকে অপর একটি দরওয়াজা খুলিয়া কা'বাকে দুই দরওয়াজাবিশিষ্ট নির্মাণ করিতাম। (কারণ প্রবেশ করার ও বাহির হওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দরওয়াজা হইলে তাহাতে ভীড় এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইত না।)

(আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভাগিনা—) আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) খলীফা হইবার দাবী করিয়া মক্কা নগরী এলাকার শাসন ক্ষমতা লাভ করতঃ ৬৪ হিজরী সনে যখন বাইতুল্লাহ শরীফের ঘরের পুনঃ নির্মাণের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া উহার পুনঃ নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন স্বীয় খালা আয়েশা (রাঃ)-এর এই হাদীছ অনুসারে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভিপ্রায় অনুযায়ী হাতীমের অংশকে ঘরের শামিল করিয়া নীচু আকারের দুই দরওয়াজাবিশিষ্ট রূপে ঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন।

আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এই হাদীছ ও বর্ণনা তাঁহার আপন ভাগিনা ওরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনাকারী এযীদ ইবনে রুমান বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) যখন বাইতুল্লাহ শরীফের পুনঃ নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) স্বয়ং এই কার্য্য পরিচালনা করিলেন। তিনি ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিমূলের চিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করার জন্য খনন কার্য্য চালাইলেন, কিন্তু কোন চিহ্ন পাওয়া যাইতেছিল না, তাই তিনি বিচলিত হইতেছিলেন। অবশেষে মানুষ পরিমাপের দেড়গুণ খনন করার পর বড় বড় পাথরে নির্মিত ভিত্তিমূল দৃষ্টিগোচর হইল। বর্ণনাকারী বলেন—আমি স্বয়ং নিজ চক্ষে ঐ ভিত্তি দেখিয়াছি; উহার পাথরগুলি উটের পিঠের ন্যায় ছিল।

এই প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনাকারীর শাগের্দ জরীর (রঃ) বলেন, আমি স্বীয় ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখনও কি আপনি ঐ ভিত্তিমূলের স্থানটি আমাকে নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইতে পারিবেন? তিনি বলিলেন, এখনই চল তোমাকে দেখাইব। তখন আমি তাঁহার সঙ্গে হাতীমের বেষ্টনীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। তিনি একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন, এই স্থানে সেই ভিত্তি অবস্থিত।

জরীর (রঃ) বলেন—আমি ঐ ভিত্তিস্থান হইতে বর্তমানে নির্মিত বাইতুল্লাহ-ঘরের সীমার মধ্যবর্তী স্থানটুকুর পরিমাপ করিলাম, তাহাতে আমার অনুমান হইল—ঐ স্থানটি (উত্তর দক্ষিণে) ছয় হাত পরিমিত দীর্ঘ হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের যমানায় ক্রোধান্বিত ঐশ্বরিক শক্তিতে পরিচালিত সর্বগ্রাসী তুফানের ধ্বংসলীলা সমগ্র বিশ্বের ধ্বংস সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে বাইতুল্লাহ

শরীফের পূর্ব নির্মিত ঘরেরও বিলুপ্তি সাধন করে। যেরূপ আল্লাহ তায়ালার কুদরতের নিদর্শন আপদ-বিপদ, রোগ-ব্যাধি, পীর-পয়গাম্বর, নবী-রসুল সকলকেই গ্রাস করিয়া থাকে। আল্লার কুদরত সর্বতোমুখী, তাই বাইতুল্লার ঘর বিলুপ্ত হইল বটে, কিন্তু আল্লার কুদরত আবার উহার বিশিষ্ট বিশিষ্ট দ্রব্যাদিকে হেফাজতও করিয়াছিল। অতঃপর সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে ইব্রাহীম (আঃ) ও তদীয় পুত্র ইসলাঈল (আঃ) ঐ ঘরের পুনঃ নির্মাণ করেন। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে কোরায়েশগণ কর্তৃক উহা পুনঃ নির্মিত হয় এবং ছোট আকারে নির্মিত হয়, যাহার ঘটনা উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত আছে। তৎপর আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কর্তৃক সঠিকরূপে স্বর্ণ মাপে পুনঃ নির্মিত হয়। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের ক্ষমতার পতনের পর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের প্রতিনিধি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ভাবিল, বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ চির জাগরুক এই নিদর্শন আমাদের শত্রু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রূপে কায়েম থাকা আমাদের পক্ষে ভাল হইবে না। এই ভাবিয়া সে স্বীয় আমীরের আদেশ লইয়া ঐ ঘর ভাঙ্গিয়া পুনরায় কোরায়েশদের নির্মিত আকারে তৈরী করে। যুগের পরিবর্তন সাধনকারী শক্তির ধ্বংসলীলার স্রোত প্রবাহে ঐ সমস্ত দাম্ভিক ব্যক্তিরা ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিলীন হইয়া গেলে অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের মধ্যে বাদশাহ হারুনুর-রশীদ বা অন্য কোনও বাদশাহ হাজ্জাজ কর্তৃক কোরায়েশদের নির্মিত আকারে তৈরী ঘরকে পুনরায় ভাঙ্গিয়া আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কর্তৃক হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভিপ্রায় অনুসারে নির্মিত ঘরের আকারে তৈরী করার ইচ্ছা করিয়া আলেম সমাজের মতামত প্রার্থী হইলেন। তদানীন্তন মদীনাবাসী খ্যাতনামা ইমাম মালেক (রঃ) বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ইহাতে বাধা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, এইরূপ করিতে গেলে বাইতুল্লাহ শরীফ অবশেষে রাজা-বাদশাদের খেল্‌নার বস্তুতে পরিণত হইয়া যাইবে। ইমাম মালেকের এই বিজ্ঞোচিত উক্তি সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বিশ্ব-মোসলেমের নিকট অখণ্ডনীয় বিষয়রূপে গ্রহণীয় হইয়া আসিয়াছে। তদবধি আজ যুগযুগান্তর পর্য্যন্ত বাইতুল্লাহ শরীফের ঘর সেই হাজ্জাজ কর্তৃক কোরায়েশদের নির্মিত ছোট আকারে তৈরী অবস্থায়ই রহিয়াছে। বর্তমানেও উহা এক দরওয়াজাবিশিষ্ট উঁচু দরওয়াজাযুক্ত রহিয়াছে এবং হাতীমও পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে যেরূপ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় কোরায়েশদের নির্মিত অবস্থায় ছিল। (ফতহুলবারী)

হরম শরীফের ফজিলত

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শিক্ষা দেওয়া উক্তির উদ্ধৃতি দানে বলিয়াছেন—

اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ -

وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থ :—(আপনি ঘোষণা করুন,) বিশেষভাবে আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমি যেন ঐ সর্ব-শক্তিমান প্রভুর এবাদৎ—বন্দেগী ও দাসত্ব অবলম্বন করি যিনি এই মহান নগরীর প্রভু, যিনি এই মহান নগরীকে অতি উচ্চ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন এবং সমস্ত চীজ-বস্তুর একমাত্র মালিক তিনিই। আমি তাঁহার অনুগত থাকার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি (২০ পাঃ ৩রুঃ)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন –

اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ :—(আমি মক্কাবাসীদের প্রতি কত কৃপাই না করিয়াছি! দেখ—) আমি কি তাহাদিগকে এমন এক নগরীর অধিকারী করি নাই—যে নগরী অতি মহান মর্য্যাদা সম্পন্ন, শান্তিময়, নিরাপত্তার স্থান—যে নগরে আমার কৃপায় দেশ-বিদেশের সর্বপ্রকার ফল-ফুলাদি আমদানী হইয়া থাকে? কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ। (সত্যিকারের জ্ঞান তাহাদের নাই, নতুবা তাহারা এরূপ কৃপাময় দয়াল মাবুদের বিদ্রোহিতা করিত না)। (২০ পাঃ ৯ রুঃ)

৮২৬। হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ভাষণে বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালাই মক্কা এলাকাকে পবিত্র হরম শরীফ সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন—সপ্ত আকাশ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করার দিন হইতেই। অতএব আল্লাহ তায়ালার সেই সাব্যস্ত অনুসারেই উহা সেইরূপ পবিত্র হরম শরীফ হওয়া অক্ষুণ্ণ থাকিবে কেয়ামত পর্য্যন্ত। সেমতে ঐ এলাকায় যুদ্ধ-বিগ্রহ আমার পূর্বেও হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কাহারও জন্য হালাল হইবে না। একমাত্র আমার পক্ষে শুধু এক দিনের অল্প সময়ের জন্য আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উহা হালাল করা হইয়াছিল। (সেই সময়ের পর মুহূর্ত হইতে পূর্বের ন্যায় কেয়ামত পর্য্যন্ত উহা হরম শরীফ পরিগণিত থাকিবে।) উহার কোন গাছের একটি কাঁটা ভাঙ্গাও নিষিদ্ধ, উহার কোন বন্য জন্তুকে তাড়া করাও নিষিদ্ধ এবং উহার পথে পাওয়া কোন বস্তু, মালিকের সন্ধান লাভের জন্য বিশেষরূপে ঢোল-শোহরত করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে উঠাইয়া লওয়াও নিষিদ্ধ। উহার কোন ঘাস-পাতা তৃণ-লতা ছিন্ন করাও নিষিদ্ধ। তখন আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! 'এজখের' নামীয় ঘাসকে এই নিষেধাজ্ঞার বহির্ভূত রাখুন; কারণ উহা আমাদের গৃহের জন্য এবং কর্মকারদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। নবী (দঃ) বলিলেন আচ্ছা—এজখের ঘাস এই নিষেধাজ্ঞার বাহিরেই থাকিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বন্য জন্তু তাড়া করার মধ্যে ইহাও শামিল যে, কোন একটি পশু বা পক্ষী কোন ছায়া স্থলে বিশ্রাম নিয়াছে, তুমি তথায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য উহাকে তাড়াইয়া দিবা ইহাও নিষিদ্ধ।

হরম শরীফের মসজিদে সকলের সমান অধিকার

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন (১৭ পাঃ ৩রুঃ)—

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً نِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.

অর্থ ঃ—যাহারা কুফুরী করে এবং আমার (দীনের) রাস্তায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং মসজিদে-হারামের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে (যেরূপ হোদায়বিয়ার ঘটনায় মক্কার কাফেররা করিয়াছিল;) যে মসজিদে আমি প্রত্যেকের সমান অধিকার দিয়াছি—নিকটবর্তী বাসিন্দা হউক বা দূরপ্রান্তের আগন্তুক হউক। স্মরণ রাখিও, যে ব্যক্তি ঐ মসজিদের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে নিয়ম বিরোধী কার্য্য করিবে তাহাকে কষ্টদায়ক আজাব ভোগে বাধ্য করিব।

মক্কাস্থিত হযরতের বাড়ী

৮২৭। হাদীছ ঃ—উছামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) (মক্কা বিজয়ের ঘটনায় বা বিদায় হজ্জের সময় মক্কা নগরীতে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা রাসুলাল্লাহ! আপনি আগামী কল্য মক্কায় প্রবেশ করিয়া কোথায় অবস্থান করিবেন, আপনার (পৈত্রিক) বাড়ীতে অবস্থান করিবেন কি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমার পৈত্রিক বাড়ী আছে কোথায়? (চাচা আবু তালেবের ছেলে) আকীল বাড়ী-ঘর সব বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পিতামহ—আবদুল মোত্তালেব স্বীয় পিতা হেশাম ইবনে আবদে-মনাফ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে একখানা বাড়ী লাভ করেন। আবদুল মোত্তালেব বৃদ্ধ বয়সে স্বীয় পুত্রদ্বয়—আবদুল্লাহ (হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর পিতা) এবং আবু তালেবের মধ্যে ঐ বাড়ীখানা বন্টন করিয়া দেন। ঐ বাড়ীতেই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় পিতার অংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি হিজরত করিয়া চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার চাচার ছেলে আকীল সম্পূর্ণ বাড়ীটি দখল করিয়া বিক্রি করিয়া ফেলে।

হযরতের চাচা আবু তালেবের চার পুত্র ছিল। আকীল, তালেব, জাফর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)। তন্মধ্যে জাফর (রাঃ) ও আলী (রাঃ) মোসলমান ছিলেন, আকীল ও তালেব অমোসলেম। অতএব, কেবলমাত্র শেষোক্ত দুইজন আবু তালেবের উত্তরাধিকারী গণ্য হয়, জাফর ও আলী (রাঃ) উত্তরাধিকারী গণ্য হন নাই। (অতঃপর তালেব নিখোঁজ হইয়া গেলে সম্পূর্ণ বাড়ী ঘরের উত্তরাধিকারী একমাত্র আকীল থাকিয়া যায়।)

ওমর (রাঃ) বলিলেন, উক্ত ঘটনার দ্বারাও এই মছআলাহ প্রমাণিত হয় যে, মোসলেম ও অমোসলেমের মধ্যে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বহাল থাকে না।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন—

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ۔ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ رَبَّنَآ اِنِّىْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ۔ رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ۔ رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ۔

অর্থ—স্মরণ রাখিও, ইব্রাহীম (রাঃ) আল্লার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া ছিলেন, হে প্রভু! তুমি এই (মক্কা) শহরটিকে শান্তিময় নিরাপত্তার শহর বানাইয়া দাও এবং আমাকে ও আমার বংশধরকে মূর্তিপূজা হইতে বাঁচাইয়া রাখ। হে প্রভু! এসব মূর্তি বহু মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ হইয়াছে। (তাই এই প্রার্থনা জানাইলাম; তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে উহা হইতে

বাঁচিতে সক্ষম হইব না। সকল প্রকার মূর্তিপূজা হইতে দূরে থাকার চেষ্টায়) যে আমার অনুসারী হইবে সে আমার দলভুক্ত, আমার দোয়া তাহারই জন্য। পক্ষান্তরে যে আমার বিরোধী হইবে (সে কাফের হইবে, কাফেরের জন্য ক্ষমার দোয়া করা যায় না।) তুমি ক্ষমাকারী দয়ালু। (দয়াবলে তাহাদেরে ক্ষমার যোগ্য করিয়া লইয়া ক্ষমা করিতে পার।)

হে আমাদের প্রভু! আমি আমার স্ত্রী ও কচি শিশু-পুত্রকে তোমার মর্য্যাদাপূর্ণ ঘরের নিকটবর্তী উৎপাদনে অক্ষম প্রস্তরময় এক নির্জন ময়দানে (তোমার আদেশে) রাখিয়া যাইতেছি। হে প্রভু! তাহাদিগকে নামায কায়েম করার তৌফিক দান করিও এবং এই জনশূন্য ময়দানকে তুমি আবাদ করিয়া দিও এবং ফল-ফুলাদি খাদ্য বস্তুর ব্যবস্থা তাহাদের জন্য করিয়া দিও; এই সব নেয়ামতের অছিলায় তাহারা শোকর আদায় করার সুযোগ লাভ করিবে।

হে প্রভু! তুমি আমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব অবস্থাই অবগত আছ। আল্লাহ তায়ালার নিকট আসমান-জমিনের কোন বস্তুই লুকায়িত নাই। আল্লাহ তায়ালার জন্য সমুদয় প্রশংসা যে, তিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক পুত্রদ্বয় দান করিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু দোয়া কবুল করেন।

হে প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার বংশধরকে নামায কায়েমকারী হওয়ার তৌফিক দান করিও। হে প্রভু! আমাদের দোয়া কবুল কর।

হে প্রভু! তুমি আমার এবং আমার মাতা-পিতার এবং সমস্ত মোমেনগণের (মধ্য হইতে ক্ষমার যোগ্যদের) প্রতি হিসাবের দিন ক্ষমা প্রদর্শন করিও। (১৩ পাঃ ১৮ রুঃ)

কা'বা শরীফ ইহজগতের স্থিতির ধারক

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ

"সম্মানিত ঘর কা'বা শরীফকে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির স্থিতির ধারক বানাইয়াছেন।" (৭ পারা ৩ রুকু)

অর্থাৎ যত দিন এই সম্মানিত গৃহ ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান থাকিবে ততদিনই মানব জাতি এবং ইহার জন্য সারা বিশ্বজগৎ বিদ্যমান থাকিবে। সম্মানিত কা'বা গৃহের বিলুপ্তির অনতি ব্যবধানেই মহাপ্রলয়ে ইহজগতের অবসান হইবে। এই তথ্যের অধিক বিবরণ "বাইতুল্লাহ শরীফের বিনাশ সাধন" পরিচ্ছেদে দেখুন।

৮২৮। হাদীছ ঃ—আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের অতি নিকটবর্তী সময়ে ইয়াজুজ-মাজুজ দলের আবির্ভাব হওয়ার পরেও বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ ও ওমরা অনুষ্ঠিত হইবে। বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জব্রত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় আসিবে না।

বাইতুল্লাহ শরীফকে গেলাফ দ্বারা আচ্ছাদিত রাখা

৮২৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম-পূর্ব যুগে কোরায়েশরাও আশুরার রোযা রাখিত। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও তখন ঐ রোযা রাখিতেন এবং মদীনায় আসিয়াও রমজানের রোযা ফরজ হওয়ার পূর্বে এই আশুরার রোযা নিজেও রাখিয়াছেন, সকলকে এই রোযা রাখার আদেশও করিয়াছেন। কারণ, ঐ দিনটি এই হিসাবেও মাহাত্ম্যপূর্ণ ছিল যে, প্রাচীনকাল হইতেই (প্রতি বৎসর) ঐ দিনে বাইতুল্লার উপর নুতন গেলাফ প্রদান করা হইত।

রমজানের রোযা ফরজ হইবার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আশুরার রোযা ইচ্ছা হইলে রাখা যাইবে এবং ইচ্ছা হইলে ছাড়াও যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ—বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার প্রখ্যাত মোহাদ্দেছ হাফেজ ইবনে হজর আসকালানী (রঃ) যিনি অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও হাফেজে-হাদীছ তিনি লিখিয়াছেন, আশুরার দিন বাইতুল্লাহ শরীফের উপর নুতন গেলাফ দেওয়ার রীতি পরিবর্তিত হইয়া এই রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে যে, হজ্জের মৌসুমে কোরবাণীর দিন যখন সমস্ত লোক মিনার ময়দানে হজ্জ উদযাপনে ব্রতী থাকে, সেই দিন বাইতুল্লার উপর নুতন গেলাফ দেওয়া হয়। বর্তমানেও এই নিয়মই প্রচলিত।

ফতহুলবারী নামক কিতাবে উল্লিখিত কতিপয় রেওয়ায়েতের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বাইতুল্লাহ শরীফের উপর গেলাফ প্রদান বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। এমনকি, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) হইতেই ইহা প্রথম আরম্ভ হয়। অধিকন্তু ইহারও প্রমাণ আছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং খোলাফায়ে-রাশেদীনের আমলেও এই রীতি বিদ্যমান ছিল এবং সর্বদা মোসলমান বাদশাহগণ ইহার প্রচলন অব্যাহত রাখিয়াছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙ্গের রেশমী গেলাফ দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয় এবং সর্বশেষ বারে কাল রেশমী গেলাফ প্রদান করা হয়, তদবধি ঐ নিয়মই প্রচলিত থাকে। এমনকি ৭৪৩ হিঃ সনে সুলতান ছালেহ—ইসমাঈল ইবনে নাছের কর্তৃক মিশরের একটি এলাকা উহার ব্যয়ভার বহনের জন্য ওয়াকফ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; মিশর হইতে ঐ গেলাফ তৈরী হইয়া আসিত। এখন সৌদী আরবেই উহা তৈরী হয়; জিদ্দা হইতে মক্কার পথের কিনারায় ঐ গেলাফ তৈরীর বিশেষ কারখানা আছে।

কা'বা শরীফের বিশেষ সম্মানে যেরূপ একমাত্র উহারই বৈশিষ্ট্যরূপে প্রচলিত রহিয়াছে উহাকে মূল্যবান গেলাফে আচ্ছাদিত করা; তদ্রূপ প্রাচীনকালে কা'বা শরীফের নামে স্বর্ণ-চান্দি ইত্যাদি মূল্যবান ধন-রত্ন নজর-নেয়াজরূপেও প্রদত্ত হইত এবং সেই সব ধন-রত্ন রক্ষিত থাকিত। ইসলাম পূর্বকালে কা'বা গৃহের নব নির্মাণের সময় লোকেরা ঐ ধন-রত্ন

কা'বা গৃহের সুউচ্চ পোঁতায় পোঁতিয়া রাখিয়াছে। অদ্যাবধি উহা ঐ অবস্থায়ই আছে; কা'বা গৃহের পোঁতা মানব দৈর্ঘ অপেক্ষাও অধিক উচু। নিম্নের হাদীছে উক্ত তথ্যের বর্ণনা রহিয়াছে—

৮৩০। হাদীছ ঃ—শায়বা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা খলীফা ওমর (রাঃ) হরম শরীফের মসজিদে বসিয়া বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয়—কা'বা শরীফের পোঁতার মধ্যে ভুগর্ভে যে সোনা চান্দি পোঁতা রহিয়াছে উহা বাহির করিয়া গরীব মোছলমানদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেই। আমি তাঁহাকে বলিলাম, এরূপ করার অধিকার আপনার নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? আমি বলিলাম, আপনার মুরুব্বিদ্বয়—রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) ইহা করেন নাই। (অথচ তাঁহারাও ইহার খোজ রাখিতেন এবং আপনার অপেক্ষা তাঁহাদের সময়ে মোসলমানদের ধনের প্রয়োজন অধিক ছিল।) ওমর (রাঃ) নতশিরে বলিলেন, সত্যই— তাঁহারা দুইজন অবশ্যই অনুসরণীয়; আমি তাঁহাদেরই পদাঙ্কে চলিব।

ব্যাখ্যা ঃ—কা'বা শরীফে প্রোথিত ধন-রত্ন স্থানান্তর না করা যুক্তিযুক্ত এবং কল্যাণকরই হইয়াছে। যদিও প্রয়োজনে কা'বা শরীফের সংস্কার ইত্যাদির ব্যয়ভার বহনের জন্য মোসলমানদের মধ্যে সর্বদাই লোক পাওয়া যাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক, যেরূপ অদ্যাবধি হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কা'বা শরীফকে প্রত্যাশী না রাখিয়া স্বাবলম্বী রাখাই উহার সম্মানের পক্ষে শ্রেয়। এতদ্ভিন্ন কা'বার নামে পূর্ব রক্ষিত নজর-নেয়াজ মোসলমানগণ নিজেদের জন্য ব্যয় করিলে তাহা বিধর্মীদের চোখে মোসলেম সমাজের উপর নিন্দার কারণ হইত। তাই পূর্ব হইতে যাহা জমা ছিল উহাকে রক্ষিত রাখা হইয়াছে। কিন্তু সর্বদার জন্য ঐ প্রথা চালু রাখার প্রয়োজন মোটেই নাই; অতএব ছাহাবীদের যুগ হইতেই কা'বা শরীফের নামে নজর-নেয়াজ গ্রহণের ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। কা'বা শরীফের জন্য নির্দিষ্ট যুগ-যুগান্তের খাদেম-বংশধর ওসমান ইবনে তালহা হাজাবী (রাঃ) ছাহাবীর পুত্র – আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী বিশিষ্ট তাবেয়ী শায়বা (রঃ) জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত ঐরূপ নজর-নেয়াজ গ্রহণ না করিয়া তাহাকে আলোচ্য হাদীছ শুনাইয়াছেন (ফতহুলবারী ৩—৩৫৭)। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কা'বা শরীফে যে ধন রক্ষিত আছে উহাই যথেষ্ট; আরও অধিক ধন সংরক্ষণ নিষ্প্রয়োজন। কা'বা শরীফের জন্য দেওয়া নজর-নেয়াজের ধন গরীবদের মধ্যে বিতরণই শ্রেয়ঃ। ফেকার কিতাবেও মছআলাহ রহিয়াছে—দান-খয়রাতের নজর-মান্নত কা'বা শরীফ ইত্যাদি যে কোন বিশেষ স্থান বা পাত্রের জন্য নির্ধারিত করা হইলেও উহা অন্যত্র যোগ্য পাত্রে ব্যয় করা হইলে সেই নজর-মান্নত আদায় হইয়া যায়।

কা'বা শরীফের বিনাশ সাধন

৮৩১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন (কেয়ামত ঘনাইয়া আসিলে এবং পৃথিবীর ধ্বংস ও বিলুপ্তি নিকটবর্তী

হইলে দস্যু প্রকৃতির) এক হাবশী—নিগ্রো লোক যাহার পায়ের গোছা অপেক্ষাকৃত সরু হইবে, সে বাইতুল্লাহ শরীফকে বিধ্বস্ত করিবে।

৮৩২। হাদীছ ঃ- ইবনে আববাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (বাইতুল্লাহ বিধ্বস্তকারী ব্যক্তির আকৃতি-প্রকৃতি ও তাহার হুলিয়া এত স্পষ্টরূপে আল্লাহ তায়ালা আমাকে অবগত করাইয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তি ও তাহার কার্য্যকলাপ যেন আমার চোখে ভাসিতেছে—) আমি যেন দেখিতেছি, কৃষ্ণবর্ণ বাঁকা গোছাযুক্ত ব্যক্তিটি বাইতুল্লাহ শরীফের এক একটি পাথর বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে বিধ্বস্ত করিতেছে।

ব্যাখ্যা ঃ—জাগতিক নিয়মাধীনেও সাধারণতঃ এরূপ দেখা যায় যে, কোনও রাজা-বাদশাহ যখন কোন জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং ঐ আয়োজন অনুষ্ঠানের পরিবেশে কোন মঞ্চ ইত্যাদি বিশিষ্ট স্থান নির্মাণ করেন; সে অবস্থায় যাবৎ বাদশাহ ঐ অনুষ্ঠানকে অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাওয়ার এবং অক্ষুণ্ন রাখার ইচ্ছা করেন তাবৎ কোন ব্যক্তিই বিশিষ্টরূপে নির্মিত ঐ স্থান বা মঞ্চটির কোন প্রকার ক্ষতি সাধনে অগ্রসর হওয়াত দূরের কথা উহাকে কেহ স্পর্শ করিতেও সক্ষম হয় না। কোন অশুভ শক্তি উহার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইলে বাদশাহ তাহার অপ্রতিহত ক্ষমতাবলে উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া সমুচিত শিক্ষা ও শাস্তির বিধান করিয়া থাকেন। অধিকন্তু ঐ শাহী মর্য্যাদাপূর্ণ মঞ্চটিকে অহরহ সযত্নে রক্ষা করিবার যথোপযুক্ত সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করতঃ উহার মান-মর্য্যাদাহানিকর কোন কার্য্য বা সামান্যতম প্রচেষ্টাকেও তিনি বরদাশত করেন না।

কিন্তু অবলীলাক্রমে যখন ঐ অনুষ্ঠানের অবসান করতঃ উহার সমাপ্তির সময় আসে, তখন বাদশার জ্ঞাতসারেই ঐ আয়োজিত অনুষ্ঠানের অন্যান্য আনুসঙ্গিক পরিবেশ বিচ্ছিন্ন করার পূর্বে ঐ সুরক্ষিত মঞ্চটিকেই সর্ব প্রথমে বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করতঃ অনুষ্ঠান সমাপ্তির সূচনা করা হয় এবং অতি সাধারণ লোক কামলা-মজুরের হস্তেই উহাকে বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করা হইয়া থাকে।

অনুরূপভাবে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটিও সর্বশক্তির আধার—সমগ্র বাদশাহগণের বাদশাহ আল্লাহ তায়ালার অনুষ্ঠানবিশেষ। এবং বাইতুল্লাহ শরীফ হইতেছে এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি স্বরূপ মহান মর্য্যাদপূর্ণ মঞ্চ সদৃশ। তাই যাবৎ এই সুবিশাল অনুষ্ঠান তথা পৃথিবীকে অক্ষুণ্ন ও বিদ্যমান রাখার ইচ্ছা আছে, তাবৎ আল্লাহ তায়ালা ঐ মঞ্চ সদৃশ বাইতুল্লাহ শরীফের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। আজ অবধি যে কোনও অশুভ শক্তি ঐ মহান মঞ্চের মর্য্যাদা হানিকর কোন কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে, উহাকেই আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ আবরাহার ন্যায় পরাক্রমশালী এবং অপরাজেয় শক্তিকে মুহূর্তের মধ্যে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার ঘটনা কোরআন শরীফের মধ্যেই বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নের হাদীছও উহার আর একটি দৃষ্টান্ত বহন করে।

পক্ষান্তরে যখন এই সমগ্র অনুষ্ঠান তথা পৃথিবীর অস্তিত্বকে বিলুপ্ত ও ধ্বংস করিয়া দেওয়াই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইবে, তখন ঐ সুরক্ষিত মঞ্চ সদৃশ বাইতুল্লাহ শরীফকেই সর্বপ্রথমে বিধ্বস্ত করা হইবে এবং অতি সাধারণ লোকের হস্তেই উহার বিলুপ্তি ও ধ্বংস-কার্য্য সাধিত হইবে।

৮৩৩। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত বিরাট একদল লোক বাইতুল্লাহ শরীফের উপর আঘাত হানিবার জন্য অগ্রসর হইবে। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই কোন একটি ময়দানে ময়দানস্থিত তাহাদের সকলকে ধ্বসাইয়া দেওয়া হইবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! সকলকেই কেন ধ্বসানো হইবে? অথচ সেখানে এমন এমন লোকও ত থাকিতে পারে যাহারা সেস্থানে শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আসিয়াছে বা জবরদস্তিরূপে তাহাদিগকে উক্ত দলে শামিল করা হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ঐ সময় সকলকেই ধ্বসানো হইবে। পরে কেয়ামতে হিসাব-নিকাশের দিন নিয়্যতের তারতম্য রক্ষা করা হইবে। (২৮৪ পৃঃ)

হজরে-অসওয়াদ চুম্বন করা

৮৩৪। **হাদীছ ঃ**—আবেছ ইবনে রবীয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) একবার হজর-আসওয়াদের প্রতি অগ্রসর হইয়া উহাকে চুম্বন করিলেন। অতঃপর বলিলেন, (তোমরা ভালরূপে শুনিয়া ও উপলব্ধি করিয়া রাখিও, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—হে হজরে-আসওয়াদ!) আমি জানি ও দৃঢ়তার সহিত এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র; কাহারও কোন ভাল বা মন্দ করিবার কোনরূপের ক্ষমতা তোমার আদৌ নাই। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তোমাকে চুম্বন করিয়াছেন। (সে সূত্রে তোমাকে চুম্বন করা শরীয়তের একটি নিয়ম; তাই আমি তোমাকে চুম্বন করিলাম;) নতুবা আমি তোমাকে কখনই চুম্বন করিতাম না। (অর্থাৎ তোমাকে খোদার অংশীদার বা আমার ভাল মন্দের মালিক-মোখতাররূপে চুম্বন করি না, শুধু আল্লার রসুলের অনুসরণে চুম্বন করি।)

সুধী পাঠক! ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই উক্তিটি অতিশয় সারগর্ভ এবং অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ। ঈমান ও কুফর, তৌহীদ ও শেরক, একত্ববাদ ও পৌত্তলিকতার বিরাট পার্থক্য ও ব্যবধানের রহস্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটন কল্পেই তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন।

ইসলাম অনুমোদিত ও শরীয়ত নির্দ্ধারিত কোন কোন এবাদতের রীতি নীতির বিশেষতঃ হজ্জের অধিকাংশ কার্য্যাবলী ও আমলের বাহ্যিক ধারা ও গতি-প্রকৃতি দৃষ্টে শয়তান অতি সহজে ধোকা দেওয়ার বা মানুষের অন্তরে নানারূপে কু-প্ররোচনামূলক

অছওয়াছা উদিত করার প্রয়াস পাইয়া থাকে। যেহেতু অন্যান্য বিধর্মী কাফের মোশরেকরা যেরূপ নানাপ্রকার জড় বস্তুকে ভজনা উপাসনা করিয়া থাকে মোসলমানদের হজ্জব্রতের রীতি এবং ধারাসমূহও আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রায় অনেকটা ঐরূপ দেখায়। যথা—বাইতুল্লাহ শরীফের চতুঃসীমা ঘুরিয়া তওয়াফ করা। হজ্‌রে-আসওয়াদ তথা বিশেষ পাথর খণ্ডকে ভক্তিভরে চুম্বন করা। বিভিন্ন ময়দানে অবস্থান করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঐরূপ কু-অছওয়াছার মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই উক্তি। কিন্তু উহার বিশ্লেষণের পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ একটি যুক্তিগত বিষয় উপলব্ধি করা আবশ্যক। বিষয়টি এই—

অনেক ক্ষেত্রে দুইটি বস্তুর মধ্যে রাত্র-দিন অপেক্ষাও অধিক পার্থক্য এবং ব্যবধান থাকে; হয়ত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বস্তুদ্বয়ের মৌলিক পার্থক্যকে উপেক্ষা করিয়া কিম্বা উহাকে নগণ্য মনে করিয়া সেই বস্তুদ্বয়কে সমপর্য্যায়ের গণ্য করা নিতান্তই বোকামী। যেমন—একটি ঘুমন্ত মানব-দেহ এবং আর একটি মৃত মানব-দেহ পাশাপাশি পতিত আছে। বাহ্যিক সাদৃশ্য দৃষ্টে উভয়কে সমপর্য্যায়ের গণ্য করা কিম্বা সামান্য একটু বায়ু তথা শ্বাস প্রশ্বাস নির্গত হওয়া না হওয়ার পার্থক্যকে নগণ্য ভাবিয়া উভয়ের ব্যবধানকে উপেক্ষা করা নিতান্তই বোকামী। এস্থলে সামান্য বায়ুটুকুর পার্থক্য এতই ক্রিয়াশীল যে, উহার দরুন উক্ত দেহ দুইটির মধ্যে আইন, বিধান এবং বাস্তবেও রাত্র-দিন অপেক্ষা অধিক ব্যবধান সর্বজনীন স্বীকৃত। তদ্রূপ বিবাহিতা নারী ও পর-নারী উভয়ের মধ্যে নীতিগত প্রভেদ রহিয়াছে; সেই প্রভেদকে নগণ্য মনে করিয়া উহাকে উপেক্ষা করা কতই না বোকামী! উভয়ের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্যের পরিবর্তন না আসিলেও নীতিগত প্রভেদ ও পার্থক্যের দরুণ উভয়ের মধ্যে কিরূপ আকাশ-পাতালের ব্যবধানই না রহিয়াছে! এই দৃষ্টিতেই মূল আলোচ্য বিষয়টা লক্ষ্য করা আবশ্যক—

কাফের-মোশরেকরা যে, দেব-দেবী বা বিভিন্ন বস্তুর পূজা করিয়া থাকে; আর মোমেন-মোসলমানগণ কোন বস্তুকে ভক্তি ও সম্মানের সহিত কেন্দ্র করিয়া আল্লাহ তায়ালার এবাদত-বন্দেগী করিয়া থাকে—এই সম্প্রদায়দ্বয়ের কার্য্যক্রমের মৌলিক ব্যবধান ও পার্থক্যটা বস্তুতঃ রাত্র-দিন আলো-অন্ধকার এবং মৃত-ঘুমন্তের ব্যবধান অপেক্ষাও অধিক। কারণ, উভয় কার্য্যক্রমের মধ্যে নীতিগত, উদ্দেশ্যগত ও গভীর ক্রিয়াশীল নিগুঢ় তত্ত্বজনক পার্থক্য এবং সুপ্রশস্ত ব্যবধান বিদ্যমান রহিয়াছে; যদ্দরুণ একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত, একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই মৌলিক ব্যবধান ও পার্থক্য প্রকাশার্থেই ওমর (রাঃ) উল্লিখিত উক্তি করিয়াছিলেন। সেই ব্যবধান ও পার্থক্যের বিবরণ হইল এই যে, কোনও জড় বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া এবাদত বা উপাসনা করার তিনটি পর্য্যায় আছে। যথা—

প্রথম—আল্লাহ তায়ালাকে যেরূপ ভাবে সরাসরি উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার এবাদৎ ও উপাসনা করা হয় ঐ বস্তুটিকে তদ্রূপ সরাসরি উদ্দেশ্য করিয়া এবাদৎ ও উপাসনা করা।

দ্বিতীয়—আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর এবাদত উপাসনা এই ভাবিয়া করা যে, আল্লাহ তায়ালা অতি মহান। তাঁহার নৈকট্য লাভের জন্য ঐ বস্তু-বিশেষকে আল্লাহ তায়ালা হইতে নিম্ন শ্রেণীর মাবুদরূপে কল্পনা করিয়া উহার এবাদত ও উপাসনা করা। অর্থাৎ—এবাদৎ ও উপাসনা করা হইবে আল্লাহ ভিন্ন ঐ নিম্ন শ্রেণীর মাবুদেরই জন্য, অবশ্য সেই বস্তুবিশেষ—নিম্ন শ্রেণীর মাবুদের পূজা ও উপাসনার উদ্দেশ্য হইবে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করা।

এই উভয় পর্য্যায়ের উপাসনাই কুফরী ও শেরক। কাফের ও মোশরেকরা যে নানা প্রকার ব্যক্তি, বস্তু বা মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে তাহা এই দুই পর্য্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়—কোনও জড় বস্তুকে কেন্দ্র করা হইয়া থাকিলেও মূল এবাদৎ ও বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইয়া থাকে। বন্দেগীর মধ্যে কোন পর্য্যায়েই ঐ বস্তুর প্রতি এবাদতের সামান্যতম উদ্দেশ্যও নিহিত রাখা হয় না, বরং সামগ্রিক বন্দেগী ও এবাদৎ খাঁটীরূপে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য করা হয়। আর এবাদতের আনুষঙ্গিকরূপে যে বস্তুকে কেন্দ্র করা হয় তাহাও একমাত্র আল্লাহ বা আল্লার প্রতিনিধি রসুলের আদেশক্রমেই করা হয়। এমনকি, ঐ বস্তুকে কেন্দ্র করার যুক্তি এবং সুফল বুঝে আসিলে বা না আসিলে—উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের আদেশ অনুসারেই উক্ত বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া আল্লার এবাদৎ ও বন্দেগী করা হয়। তাই এই বস্তু-বিশেষকে কেন্দ্র করার মধ্যেও আল্লাহ তায়ালারই বন্দেগী ও দাসত্ব পরিস্ফুটিত হয়। এই তথ্যটি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিম্নে বর্ণিত আয়াতে বলিয়াছেন—

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔

অর্থ—কেবলাকে নির্দ্ধারিত করার উদ্দেশ্য ইহাই যে, আমি দেখিতে চাই—কোন ব্যক্তি আমার প্রতিনিধি রসুলের (আদেশ তথা আমার) আদেশের অনুসারী হয় আর কোন্ ব্যক্তি উহার প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করে। (২ পাঃ ১ রুঃ)

এই তৃতীয় পর্য্যায়টিই হইল মোমেন ও মোসলমানগণের কার্য্যধারা এবং ইহারই প্রতি ওমর (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

অবশ্য হজরে-আছওয়াদ, বাতুল্লাহ শরীফ, ইত্যাদি বস্তু ও স্থান সমূহকে তাজীম করা তথা উহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকেও মোসলমানগণ অত্যাবশ্যক মনে করেন। কারণ, আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত কেন্দ্রসমূহ সম্মানের উপযুক্ত হওয়া অতি স্পষ্ট বিষয়, ইহার অর্থ কখনও এই নহে যে, মুসলমানগণ ভ্রম ক্রমেও ইহাদিগকে উপাস্য সাব্যস্ত করতঃ উহাদের প্রতি তাজীম-প্রদর্শন করিয়া থাকে। বলাবাহুল্য, তাজীম তথা সম্মান প্রদর্শন করা ভিন্ন জিনিষ এবং এবাদৎ তথা উপাসনা ভিন্ন জিনিষ।

মোমেন-মোসলমান এবং কাফের-মোশরেক সম্প্রদায়দ্বয়ের কার্য্যধারার বিরাট ব্যবধানকে পবিত্র কোরআন আরও কত বিরাট আকারে প্রকাশ করিয়াছে যে—

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ـ

"অন্ধ এবং দর্শক সমান নহে, অন্ধকার এবং আলো সমান নহে, ঠাণ্ডা এবং গরম সমান নহে। আর জীবন্ত এবং মৃতও সমান নহে।" বিভিন্ন শ্রেণীর বিপরিতমুখী দুই দুইটি বস্তুর দৃষ্টান্ত দানে মোমেন ও মোশরেক সম্প্রদায়দ্বয়ের কার্য্যধারার ব্যবধান এবং পার্থক্য ও প্রভেদকে বুঝান হইয়াছে।

সুধী সমাজ! স্মরণ রাখিবেন—সামগ্রিক ভাবে এবাদৎ ও উপাসনার পাত্র একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে সাব্যস্ত করা—ইহাই সমস্ত আমল এবং আমলকারীর আত্মা স্বরূপ। কারণ, মানবের সৃষ্টি ইহারই জন্য; আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

"জ্বিন এবং মানবকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি এই জন্য যে, তাহারা আমার এবাদত করিবে; অর্থাৎ অন্য কাহারও নহে।" সুতরাং যে সব কার্য্যধারায় এবং কার্য্য সম্পাদনকারীগণের মধ্যে এই আত্মা নাই উহারা মৃত; আর যে কার্য্যাধারায় এবং কার্য্য সম্পাদনকারীগণের মধ্যে এই আত্মা বিদ্যমান আছে উহারা জীবন্ত ও শ্বাসত। অতএব, মোমেন-মোসলমান এবং তাহাদের কার্য্যধারা আর কাফের-মোশরেক এবং তাহাদের কার্য্যধারার মধ্যে ততটুকুই পার্থক্য ও ব্যবধান রহিয়াছে, যতটুকু পার্থক্য ও ব্যবধান মৃত ও জীবন্তের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

অতঃপর কোন কাফের-মোশরেক যদি উল্লিখিত বক্তব্য শুনিয়া এই দাবী করিয়া বসে যে, আমরা যে সমস্ত বট-বৃক্ষ, গঙ্গা-যমুনা, পাথর-নুড়ি, কীট-পতঙ্গ, গরু-মহিষ, মুনী-ঋষী দেব-দেবী বা মূর্তি ইত্যাদিকে পূজা করিয়া থাকি তাহাও তৃতীয় পর্য্যায়রূপেই করিয়া থাকি অন্য পর্য্যায়ে নহে।

এরূপ দাবীর অসারতা ধর্মীয় বিধানাবলীর বিবরণ বিচার করিলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং কোন ধর্মের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি দানের পর ঐ ধর্মের অনুশাসন ব্যতীত অন্য কাহারও কোন নিজস্ব নীতি ও ধারার প্রতি কর্ণপাত করা যাইতে পারে না, বরং ঐ ধর্মের অনুশীলন-বিধি অনুসারেই সব কিছু স্থির করা হইবে, নতুবা তাহাকে ঐ ধর্ম পরিত্যাগের ঘোষণা দিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন ঐরূপ দাবীর অসারতা প্রমাণের প্রধান সূত্র এই যে—যদি উপাসনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যস্থল একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হন, তবে কোন বস্তুকে আনুষঙ্গিকরূপে

সেই উপাসনার কেন্দ্র করা একমাত্র তাঁহার আদেশানুক্রমেই হইতে হইবে; যাহা একমাত্র তাঁহারই প্রেরিত সত্য বাণী বা খাঁটী প্রতিনিধির মারফতেই বান্দাদের নিকট পৌছিতে পারে। তৃতীয় পর্য্যায়ের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঠিক পরিচয় ও নিদর্শন ইহাই। ইহা ব্যতীত কেবলমাত্র মৌখিক দাবী করিলেই উহা প্রতিষ্ঠিত হয় না। কারণ, উহা একটি নিয়মতান্ত্রিক বাস্তব কর্মপন্থা ও কার্য্যধারা। যেরূপ ডাক বিভাগের উদ্দেশ্যে চিঠীপত্র বাক্সে ফেলিবার একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পন্থা এই যে, উহা ডাক বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট বাক্স সমূহেই ফেলিতে হইবে, তবেই উহা ডাক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হইবে। অন্যথায় নিজস্ব বা সমাজগত মনগড়া বাক্সে পত্র ফেলিয়া যদি কেহ দাবী করে যে, ডাক বিভাগের উদ্দেশ্যে ফেলিয়াছি তবে উহা পাগলামীই গণ্য হইবে।

অতঃপর ঐ পরিচয় ও নিদর্শন তথা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দিষ্টকৃত হওয়া প্রমাণ করার জন্য যে প্রামাণ্য বস্তুর আশ্রয় লইয়া যাইতে পারে উহা হইল একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। কিন্তু ধর্ম বা ধর্মীয় গ্রন্থের আশ্রয় লইবার পূর্বে উহার সত্যতা প্রমাণের চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করিতে হইবে। এই ময়দানের একমাত্র বিজয়ী হইল ইসলাম। ইসলাম উহার প্রথম দিন হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত সময়ের জন্য ঐরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়া রাখিয়াছে। যাহার উল্লেখ কোরআন মজীদের কতিপয় স্থানে স্পষ্টাক্ষরে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কা'বা শরীফের ভিতরে নামায পড়া

৮৩৫। হাদীছ ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিলে দরওয়াজা অতিক্রম করিয়া সোজা সম্মুখের দিকে এতদূর অগ্রসর হইতেন যে, সম্মুখস্থ দেয়াল প্রায় তিন হাত ব্যবধানে থাকিত এবং তথায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এইরূপে কাজ করিয়া বস্তুতঃ সেই স্থানকে অবলম্বনের চেষ্টা করিতেন যে স্থানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায পড়িয়াছিলেন বলিয়া বেলাল (রাঃ) তাঁহাকে খোঁজ দিয়াছিলেন। অবশ্য কা'বা শরীফের ভিতরে যে কোন স্থানে নামায পড়া কাহারও জন্য দূষণীয় নহে।

বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ না করা

● ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অনেক হজ্জ করিয়াছেন, বহুবার তিনি কা'বা শরীফে প্রবেশ করেন নাই।

৮৩৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমরার নিয়্যত করিয়া মক্কায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর প্রথমে তওয়াফ করিলেন এবং পরে মকামে ইব্রাহীমের নিকটবর্তী স্থানে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। (সেই সময় তথায় শত্রুদের আশংকা বিদ্যমান থাকায়) সতর্কতামূলক

ভাবে তাঁহার সঙ্গে কিছু লোক নিয়োজিত ছিল। ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবীকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, ঐ সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কা'বা ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন কি? তিনি বলিলেন ঐ ওমরাকালীন তিনি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন নাই।

মছআলাহ ঃ—বাইতুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা জায়েয বটে, উহার প্রমাণ উপরোক্ত ৮৩৫নং হাদীছে স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু উহা কোন স্তরেই অত্যাবশ্যক আমল নহে। তাহাই উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। অতএব, বে-আদবীসূচক হুড়াহুড়ি, দস্তাদস্তি করিয়া কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিলে উহার কোণ-সমূহে তকবীর উচ্চারণ করা

৮৩৭। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মক্কা বিজয়কালীন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া কা'বা গৃহের ভিতরে কাফের-দের উপাস্য মূর্তিসমূহ বিদ্যমান থাকাবস্থায় উহাতে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং ঐ সকল মূর্তিসমূহ বাহির করিয়া ফেলিবার আদেশ করিলেন। তন্মধ্যে ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-এর দুইটি মূর্তিও বাহির করা হইল। উহাদের হাতে (জুয়া জাতীয় ভাগ বণ্টনের এবং যাত্রার শুভাশুভ নির্ধারণ বা ভাগ্য পরীক্ষা করার প্রতীক স্বরূপ) কতকগুলি তীর ছিল।* রসুলুল্লাহ (দঃ) কাফেরদের কুকাণ্ডের এই দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই তাহারা ভালরূপেই জানে যে, ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) (এই মক্কাবাসী কাফেরদের ন্যায়) কখনও জুয়া জাতীয় কোন প্রকার ভাগ-বণ্টন করিতেন না। (তাহারা মিথ্যা এই দৃশ্য দেখাইয়াছে।) অতঃপর হযরত (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং উহার প্রত্যেক কোণে তকবীর উচ্চারণ করিলেন।

তওয়াফের মধ্যে রমল করা

৮৩৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মক্কা বিজয়ের পূর্বে সপ্তম হিজরী সনে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে লইয়া ওমরাতুল-কাজা

---

* কাফেরদের মধ্যে এক প্রকার জুয়ার প্রচলন ছিল, যেমন—দশজন লোকে একত্রে সমান সমান বিশ টাকা হারে জমা করিয়া দুই শত টাকা দ্বারা একটি উট ক্রয় করিল। কিন্তু উহার গোশত বণ্টনের বেলায় সমভাবে বণ্টন করার পরিবর্তে ঐ মূর্তির হাতের তীর সমূহের নির্দেশ অনুসারে বণ্টন করা হইত। ঐ তীরগুলির মধ্যে বিভিন্ন নিদর্শন থাকিত এবং সেই নিদর্শন অনুযায়ী কেহ বেশী পাইত, কেহ কম পাইত, কেহ ফাকা ও শূন্য হস্তে যাইত।

করিতে আসিলেন। পূর্বাহ্নে মক্কাবাসী মোশরেকরা অপবাদ রটাইল যে, (আমাদের দেশ-ত্যাগী) একদল লোক আসিতেছে যাহারা মদীনায় থাকিয়া তথাকার জ্বরে-তাপে দুর্বল ও শক্তিহীন হইয়া গিয়াছে। (শত্রুপক্ষের দৃষ্টিতে দুর্বল পরিগণিত হওয়া বিপদের কারণ,) তাই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করিবে অর্থাৎ বীরদর্পে বাহাদুরীপূর্ণ গতি (Motion) প্রদর্শন করিয়া চলিবে এবং পশ্চিম-দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ কোণদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিকরূপে চলিবে। * ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, পূর্ণ সাত চক্করেই ঐরূপে চলা কঠিন হইবে; তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দয়া পরবশে শুধু তিন চক্করের মধ্যে ঐরূপে চলিবার আদেশ করিয়াছেন।

৮৩৯। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ বা ওমরা উভয়ের জন্যই মক্কা শরীফে আসিয়া প্রথমে তওয়াফের মধ্যে হজরে-আছওয়াদকে চুম্বন করিয়াছেন এবং তিন চক্করে সজোরে বীরের ন্যায় চলিয়াছেন।

৮৪০। **হাদীছ ঃ**—ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু (৮৩৪ নং হাদীছে বর্ণিত উক্তির পর প্রথমে) বলিয়াছেন যে, বর্তমানে আমাদের জন্য রমল করার আবশ্যকতা কি? আমরা কেবলমাত্র মক্কার কোরায়েশদিগকে স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ করিয়া থাকিতাম, এখন তাহাদের কোনই অস্তিত্ব নাই; আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) নিজেই পুনরায় বলিলেন, (হাঁ, প্রয়োজন আছে বৈ কি! কারণ ঐ বিশেষ উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব না থাকিলেও অন্য একটি বিশেষ কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা এই যে, বিদায়-হজ্জকালীন ঠিক এইরূপ অবস্থায়—যখন মক্কা নগরীতে মোশরেকদের অস্তিত্ব ছিল না তখনও) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমল করিয়াছিলেন। এই কারণেই উহা পরিত্যাগ করাকে আমরা পছন্দ করিতে পারি না।

ব্যাখ্যা ঃ—তওয়াফের মধ্যে রমল তথা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া চলার একটি প্রধান উদ্দেশ্য মোশরেকদের সম্মুখে নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করা ছিল বটে, কিন্তু একটি কর্যের মধ্যে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারণের সমন্বয় থাকা বিচিত্র নহে। কাজেই যদিও তখন রমল করার উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য ও কারণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তবুও হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেহেতু পূর্বাপর এমনকি, ইসলাম ও মুসলমানদের শৌর্য্য-বীর্য ও শান-শওকতপূর্ণ অবস্থায়—বিদায় হজ্জকালীন অন্য যে কোনও কারণ বশতঃ রমল

---

* পশ্চিম-দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ কোণদ্বয় সম্পর্কে এই স্থানে যাহা বলা হইল তাহা একমাত্র ঐ ওমরাতুল-কাজার ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিদায়-হজ্জকালীন স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তিন চক্করের পূর্ণ চক্করেই রমল করিয়াছেন এবং পূর্বাপর ইহাই সুন্নতরূপে প্রচলিত।

করিয়াছিলেন; তাই উহা শরীয়তের একটি বিশেষ বিধানরূপে নির্ধারিত হয়। উহার প্রতিই ওমর (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং রমল করাকে ছুন্নতরূপে সাব্যস্ত রাখিয়াছেন।

৮৪১। হাদীছ ঃ— নাফে (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, কা'বা শরীফের এই (তথা দক্ষিণ দিকের) কোণদ্বয়কে এসতিলাম করিবই; (ভিড়ের কারণে) কঠিন হউক বা সহজ হউক—যখন হইতে দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত কোণদ্বয়কে এসতিলাম করিয়াছেন।

নাফে (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, (তওয়াফের মধ্যে রমল করা তথা সজোরে চলা কালে) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উক্ত কোণদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্বাভাবিক রকমে চলিতেন কি? নাফে (রঃ) উত্তরে বলিলেন, (ভিড়ের সময়) স্বাভাবিক রকমে চলিতে বাধ্য হইতেন সহজে এসতিলাম করার জন্য।

মছআলাহ ঃ—সমস্ত তওয়াফের প্রতি চক্করে দক্ষিণ দিকের কোণদ্বয়কে এসতিলাম করা সুন্নত। অবশ্য দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ এসতিলাম করার আকার হইল—উক্ত কোণকে ভক্তিভরে উভয় হাতে স্পর্শ করা। ভক্তিভরে হাত স্পর্শ করাও শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি সাধারণ প্রথা; যেরূপ কদমবুসী তথা মুরব্বির পদদ্বয় ভক্তিভরে হাতে স্পর্শ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে "হজরে-আসওয়াদ" স্থাপিত রহিয়াছে; উহাকে এসতিলাম করার আকার হইল—ভক্তিভরে উহাকে চুম্বন করা। অবশ্য ভিড়ের দরুণ চুম্বন করা সম্ভব না হইলে অন্য ব্যবস্থার বয়ান পরে আসিতেছে।

মছআলাহ ঃ—রমল করা বস্তুতঃ পূর্ণ চক্করেই করিতে হয়। অবশ্য দক্ষিণ দিকের কোণদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্বভাবতঃই ভিড় থাকে, তাই সেস্থানে রমলের মধ্যে শিথিলতা আসিতে পারে।

ছড়ির সাহায্যে হজরে আসওয়াদ চুম্বন করা

৮৪২। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জকালে একদা উষ্ট্রের উপর আরোহিত অবস্থায় তওয়াফ করিলেন। হজরে-আসওয়াদের কোণ অতিক্রম করিতে প্রত্যেক বারেই হযরত (দঃ) তকবীর বলিতেন এবং ছড়ির সাহায্যে ইশারা করতঃ হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করিতেছিলেন।

মছআলাহ ঃ—বিশেষ ওজর বশতঃ যানবাহনের উপর ছওয়ার হইয়া তওয়াফ করা জায়েয বটে; কিন্তু বাইতুল্লাহ শরীফ যেহেতু মসজিদে-হারামের মধ্যে অবস্থিত, তাই তওয়াফ কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে মসজিদের ভিতরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অথচ মসজিদের মধ্যে কোন পশুকে লইয়া যাওয়া জায়েয নহে; কেননা, উহাদের মলমূত্র ত্যাগের সময়ের কোন ঠিক-ঠিকানা নাই।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোজেযা স্বরূপ তাঁহার ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহ আল্লাহ তায়ালার কুদরতে অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী হইয়া থাকিত। তদনুযায়ী

তাঁহার স্বীয় যানবাহন উটের প্রতি ঐ ব্যাপারে তিনি আস্থাশীল ছিলেন। তাই তিনি উহাকে মসজিদের ভিতরে লইয়া গিয়াছিলেন।

মছআলাহ ঃ— বেয়াদবী হয় বা অন্যকে কষ্ট দিতে হয় এরূপ হুড়াহুড়ি না করিয়া হজরে-আস্‌ওয়াদকে সরাসরি চুম্বন করা সহজসাধ্য হইলে তাহাই করিবে। যেমন ৮৪৬নং হাদীছে বর্ণিত হইবে।

চুম্বন করার নিয়ম—"হজরে-আস্‌ওয়াদ" অর্থ কৃষ্ণবর্ণের পাথর। আদি আমলে উহা একটি আস্ত পাথরখণ্ড ছিল, কিন্তু পূর্বকাল হইতেই উহা আর আস্ত পাথরখণ্ড থাকে নাই; ছোট ছোট টুকরায় বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। কা'বা শরীফের গায়ে—উহার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে, মানুষের বুক সমান উপরে, মাথা প্রবেশ করা যায় এই পরিমাণ খোড়ল আছে যাহার ভিতরে হজরে-আস্‌ওয়াদ বর্ণেরই বিশেষ মসলার মধ্যে হজরে-আস্‌ওয়াদের টুকরা সমূহ বিদ্ধ রহিয়াছে। টুকরাগুলি অধিকাংশই ছোট ছোট—আঙ্গুলের মাথা পরিমাণের; এক-দুইটা টুকরা বৃদ্ধাঙ্গুলির পেট বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় আছে।

নামাযে সেজদা কালে যে ভাবে উভয় হাত জমিনের উপর রাখা হয় ঐ ভাবে উভয় হস্ত উক্ত খোড়লের ভিতর এমনভাবে রাখিবে যেন হস্তদ্বয়ের মধ্য ফাঁকে হজরে-আস্‌ওয়াদের কোন টুকরা ভাসমান থাকে। খোড়লের ভিতরে হস্তদ্বয়ের উপর মুখমণ্ডল ঠেকাইয়া হস্তদ্বয়ের মধ্যস্থ হজরে-আসওয়াদ টুকরাকে এমন সতর্কতার সহিত চুম্বন করিবে, যেন উহাতে মুখের লালার কোন আদ্রতা না লাগে, হজরে-আসওয়াদ টুকরার উপর কপালও স্পর্শ করিবে। এইরূপে সরাসরি চুম্বনের সুযোগ না পাইলে উভয় হাত বা ডান হাত দ্বারা হজরে-আসওয়াদ খণ্ডকে শুধু স্পর্শ করিবে এবং হাতকে চুম্বন করিবে। ইহারও সুযোগ না হইলে ছড়ি ইত্যাদির ন্যায় কোন বস্তু হজরে-আসওয়াদ খণ্ডে স্পর্শ করিয়া ঐ বস্তুকে চুম্বন করিবে। ঐরূপ করারও সুযোগ না হইলে দূর হইতেই হজরে-আসওয়াদের প্রতি মুখ করতঃ তকবীর, কলেমা-তৈয়্যব ও দরুদ পড়িবে এবং হস্তদ্বয়ের তালু উহার মুখী করিয়া হস্তদ্বয় উহার উপর রাখার ন্যায় ইশারা করিবে, অতঃপর হস্তদ্বয়কে চুম্বন করিবে। (শামী)

বাইতুল্লাহ শরীফের কোণ ভক্তিভরে স্পর্শ করা

৮৪৩। **হাদীছ ঃ—** আবুশ-শা'ছা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোয়াবিয়া (রাঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের প্রত্যেক কোণকেই স্পর্শ করিতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, (উত্তর দিকের) কোন দুইটি স্পর্শ করার বিধান নাই। তদুত্তরে মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিলেন, বাইতুল্লার কোন অংশই পরিত্যক্ত নহে।

আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)ও প্রত্যেক কোণকে স্পর্শ করিতেন।

৮৪৪। **হাদীছ ঃ—** আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দক্ষিণ দিকের কোণদ্বয় ব্যতীত অন্য কোনও কোণকে স্পর্শ করিতে দেখি নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিটি কার্য্যপদ্ধতি অনুধাবন ও অনুসরণের প্রতি সর্বদা বিশেষ তৎপর থাকিতেন; তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর কোণদ্বয়কে স্পর্শ করিতেন না। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বয়ং এই রীতি অনুযায়ী আমলও করিয়াছেন—তিনি উত্তর কোণদ্বয়কে কোন সময়ই তওয়াফকালে স্পর্শ করিতেন না। তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন, আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি রসুলুল্লাহ (দঃ) এই কোণদ্বয়কে স্পর্শ করেন নাই। হযরত রসুলুল্লাল্লাহ (দঃ) কর্তৃক এই কোণদ্বয়কে স্পর্শ না করার কারণ স্বরূপ তিনি বর্ণনা করিয়া থাকিতেন যে, আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত (৮২৫ ও ৮৪৫ নং) হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান বাইতুল্লাহ শরীফের ঘরের সীমানার বাহিরে উত্তর পার্শ্ব-সংলগ্ন—"হাতীম" নামক স্থানটুকু বস্তুতঃ কা'বা শরীফ ঘরেরই অংশবিশেষ। কিন্তু বর্তমান কা'বা গৃহের নির্মাণকালে ঐ স্থানটুকু পরিত্যাগ করিয়া কা'বা-ঘর ছোট আকারে তৈরী করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা গেল যে, উত্তর পার্শ্বস্থ বর্তমান কোণদ্বয় বাইতুল্লাহ শরীফের প্রকৃত কোণ নহে, বরং উহা প্রকৃত প্রস্তাবে মধ্যবর্তী একটি স্থান বটে। বস্তুতঃ যেখানে বাইতুল্লাহ শরীফের কোণ হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান ছিল সেখানে কোণ স্থাপিত হয় নাই। এই কারণেই এই দিকের বর্তমান কোণদ্বয়কে স্পর্শ করা হয় নাই। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই তথ্যেরই উল্লেখ রহিয়াছে।

৮৪৫। হাদীছ ঃ—মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর পুত্র আবদুল্লাহ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীকে আয়েশা (রাঃ) হইতে এই হাদীছ বর্ণিত শুনাইলেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে বলিয়াছেন, এই তথ্য তোমার জানা নাই কি যে, তোমার বংশধররা যখন কা'বা শরীফের পুনঃ নির্মাণ করিয়াছিল তখন তাহারা ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের স্থাপিত ভিত্তির পরিমাণ হইতে কা'বা গৃহকে ছোট করিয়া দিয়াছিল?

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, তখন আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ। আপনি কা'বা ঘরকে ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া পুনঃ নির্মাণ করিবেন কি? তদুত্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমার বংশের (অধিকাংশ) লোকেরা যদি ইসলামে নবদীক্ষিত না হইত তবে আমি তাহা করিতাম।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উক্ত হাদীছ শ্রবণে বলিলেন, আয়েশা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে যে তথ্য শুনিয়াছেন উহা দ্বারাই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) হাতীমের দিকের তথা কা'বা-ঘরের উত্তর দিকের কোণদ্বয়ের এস্তিলাম—ভক্তিভরে স্পর্শ করেন নাই একমাত্র এই কারণেই যে, (কোরায়েশগণ কর্তৃক পুনঃ নির্মাণকালে) ঐ উত্তর দিকে বাইতুল্লাহ শরীফকে ইব্রাহীম আল্লাইহেচ্ছালামের ভিত্তির উপর সম্পূর্ণ করা হয় নাই।

যথাসাধ্য হজরে-অলওয়াদকে চুম্বন করা

৮৪৬। **হাদীছ ঃ**—একদা এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে হজরে-আস্‌ওয়াদ চুম্বন করার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, আমি দেখিয়াছি—রসুলুল্লাল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহাকে ভক্তি ও মহব্বতের সহিত চুম্বন করিয়া থাকিতেন। ঐ ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, বলুন ত যদি ভিড় হয় কিংবা যদি চুম্বন করিতে কষ্ট হয় তবে কি করিব? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাগান্বিত স্বরে বলিলেন, তোমার "বলুনত" বাক্যটি তোমার দেশ ইয়ামানে রাখিয়া আস, আমি উহা শুনিতে চাই না। আমি দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজরে-আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করিয়াছেন।

মছআলাহ ঃ—ভিড় থাকা অবস্থায় যথাসাধ্য নিজে কষ্ট করিয়া হইলেও হজরে-আস্‌ওয়াদ চুম্বনে সচেষ্ট হইবে। কিন্তু অন্যকে কষ্ট দিয়া বাইতুল্লাহ শরীফ ও হজরে-আস্‌ওয়াদের সম্মান ও আদবের বরখেলাফ করিয়া চুম্বনের জন্য হুড়াহুড়ি ধস্তাধস্তি করিবে না। কারণ, চুম্বন করা সুন্নত এবং ঐ সমস্ত অবাঞ্ছিত কর্ম হারাম। সুন্নত হাসিলের জন্য হারাম কার্য্যে লিপ্ত হওয়া যায় না।

মক্কায় পৌঁছিয়া সর্বপ্রথম তওয়াফ করা

৮৪৭। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কায় পৌছিয়া সর্বপ্রথম অজু করিলেন, অতঃপর তওয়াফ করিলেন।

৮৪৮। **হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ বা ওমরার জন্য প্রথম তওয়াফের তিন চক্করে "রমল" করিতেন এবং অবশিষ্ট চারি চক্করে স্বাভাবিকরূপে চলিতেন। অতঃপর (মকামে-ইব্রাহীমের নিকটবর্তী ওয়াজেবুত-তওয়াফ) দুই রাকাত নামায পড়িতেন। তৎপর ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী সায়ী করিতেন।

নারী-পুরুষ একই সময়ে তওয়াফ করিতে সতর্কতা অবলম্বন করিবে

৮৪৯। **হাদীছ ঃ**—ইবনে জোরায়েজ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হিজরী প্রথম শতাব্দীর ঘটনা—তৎকালীন বাদশাহ হেশাম-ইবনে আবদুল মালেক কর্তৃক নিয়োজিত হজ্জ-কার্য্য পরিচালনার প্রধান তথা আমিরুল-হজ্জ) ইব্রাহীম ইবনে হেশাম যখন নারীগণের প্রতি পুরুষের সঙ্গে একত্রে তওয়াফ করার নিষেধাজ্ঞা জারী করিলেন, তখন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আ'তা (রঃ) বলিলেন, নারী-পুরুষের এক সময়ে তওয়াফ করাকে কিরূপে নিষিদ্ধ করা যাইতে পারে? অথচ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণও পুরুষদের তওয়াফ করা কালেই (একই সময়ে) তওয়াফ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি নারীদের প্রতি পর্দার আদেশ জারী হওয়ার পরের ঘটনা? তিনি বলিলেন—

নারীগণ পুরুষদের সঙ্গে একত্রিত হইতেন না। (আমি দেখিয়াছি,) আয়েশা (রাঃ) পুরুষদের তওয়াফ করার সময়ে তওয়াফ করিতেন বটে, কিন্তু পুরুষগণ হইতে পৃথক থাকিয়া তওয়াফ করিতেন এবং তাহাদের সঙ্গে একত্রিত হইতেন না। (একদা) এমতাবস্থায় একটি নারী তাঁহাকে বলিল, হে উম্মুল মোমেনিন! চলুন, আমরা হজরে-আস্‌ওয়াদ চুম্বন করিয়া আসি। (যেহেতু হজরে-আস্‌ওয়াদের নিকটবর্তী স্থানে পুরুষদের ভিড় হইতে বাচিয়া থাকা কঠিন ছিল, তাই) আয়েশা (রাঃ) উহা অস্বীকার করিলেন এবং রাগান্বিত স্বরে বলিলেন—দূর।

আতা (রঃ) আরও বলিলেন, আমি দেখিয়াছি—নারীগণ বিশেষরূপে রাত্রিকালে পর্দার সহিত আসিতেন এবং পুরুষদের তওয়াফ করাকালীন কেনারায় কেনারায় তওয়াফ করিতেন। কিন্তু নারীগণ বাইতুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহারা প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেন এবং পুরুষগণকে ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত, (তৎপর নারীগণ প্রবেশ করিতেন)।

মছআলাহ ঃ—নারীগণের পক্ষে পুরুষদের সহিত হুড়াহুড়ি করিয়া বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ করা জায়েয নহে।

তওয়াফ করার সময় প্রয়োজনীয় কথা বলা

৮৫০। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা তওয়াফ করাকালে এক ব্যক্তির নিকটস্থ পথে চলিবার সময় দেখিতে পাইলেন—সে নিজকে একটি দড়ি দ্বারা বাধিয়াছে এবং অন্য এক ব্যক্তি ঐ দড়ি ধরিয়া পশুর ন্যায় তাহাকে টানিয়া নিতেছে*। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বহস্তে ঐ দড়ি কাটিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আবশ্যক হইলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাও।

ফজর ও আছরের পরে তওয়াফ করা

ফজর ও আছরের নামাযের পরে তওয়াফ করা জায়েয; ইহাতে কোন দ্বিমত নাই বলা যায়। অবশ্য তওয়াফের পরে যে, দুই রাকাত নামায পড়িতে হয় সেই নামায ফজর নামাযের পর সূর্য্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের নামাযের পর সূর্য্যাস্তের পূর্বে পড়া সম্পর্কে ইমামগণের মতাভেদ রহিয়াছে।

উক্ত দুই সময়ে ফরজ কাজা নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া নিষিদ্ধ। সে মতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ)-এর মজহাব মতে তওয়াফের নামায ঐ সময় পড়িতে পারিবে না। কোন ব্যক্তি যদি ফজর নামাযের বা আছর নামাযের পরে তওয়াফ করে তবে তাহাকে তওয়াফের নামায সূর্য্য উদয়ের বা অস্তের পরে পড়িতে হইবে।

---

* অন্ধকার যুগে এরূপ করাকে পুণ্য মনে করা হইত এবং নানাপ্রকার আপদ-বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার বা বিবিধ মকছুদ হাসিলের জন্য এরূপ করার মানত মানা হইত।

অন্য ইমামগণের মতে উদয়-অস্তের পূর্বেই তওয়াফের নামায পড়িতে পারিবে। এ সম্পর্কে ছাহাবীগণের মধ্যে উভয় রকম আমলই দেখা যায়।

● আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রঃ) তওয়াফের নামায সূর্য্য উদয়ের পূর্বে পড়িতেন, অবশ্য ঠিক উদয়ের সময় পড়িতেন না।

● একদা ওমর (রাঃ) ফজর নামাযান্তে তওয়াফ করিলেন; তওয়াফের নামায ঐ সময় পড়িলেন না, বরং "জি-তুয়া" নামক স্থানে পৌছিয়া (সূর্য্য উদয়ের পরে) তওয়াফের নামায পড়িয়াছেন।

৮৫১। হাদীছ ঃ—ওরওয়াহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কতিপয় ব্যক্তি ফজর নামাযান্তে তওয়াফ করিল, অতঃপর তাহারা ওয়াজ শুনিতে বসিল, সূর্য্যোদয়ের নিকটবর্তী সময় তাহারা তওয়াফের নামাযে দাঁড়াইল। তখন আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তাহারা বসিয়াছিল—তবুও নামাযের জন্য মকরূহ সময় থাকিতেই নামাযে দাঁড়াইল।

ব্যাখ্যা ঃ—আয়েশা (রাঃ) উল্লেখিত অবস্থায় সূর্য্য উদয়ের পরে তওয়াফের নামায পড়িতে আদেশ করিতেন।

অসুস্থতার দরুণ কোন কিছুতে চড়িয়া তওয়াফ করা

৮৫২। হাদীছ ঃ—উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ সমাপনান্তে মদীনা পানে যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন; উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-ছালামাহ (রাঃ)ও যাত্রার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তিনি বিদায়-তওয়াফ করেন নাই। তিনি হযরতের নিকট স্বীয় অসুস্থতার উল্লেখ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, ফজর নামাযের জমাত দাঁড়াইলে লোকগণ নামাযে থাকিবে তখন তুমি উটে চড়িয়া লোকদের পেছন দিয়া তওয়াফ করিয়া নিও। তিনি তাহাই করিলেন এবং তওয়াফের দুই রাকাত নামায অন্যত্র বাহিরে কোথাও পড়িয়া নিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি যখন তওয়াফ করিতেছিলাম তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফ সংলগ্নে নামায পড়িতে ছিলেন; হযরত (দঃ) ছুরা "ওয়াতুর" পাঠ করিতেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—মদীনায় যাত্রার সময় হযরতের বিবি উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) অসুস্থ হওয়ায় তিনি বিদায়-তওয়াফ করিতে পারেন নাই; বিদায়-তওয়াফ ওয়াজেব। মক্কা হইতে যাত্রার প্রক্কালে উহা আদায় করিতে হইবে, তাই নবী (দঃ) তাঁহাকে স্বীয় উট দিলেন এবং উহাতে চড়িয়া তওয়াফ আদায় করিতে বলিলেন। উটে চড়িয়া তওয়াফ করার পরিবেশ লাভের জন্য নবী (দঃ) তাঁহাকে ফজর নামাযের জমাত হওয়াকালে তওয়াফ করার পরামর্শ দিলেন। নামাযীদের যেন বিব্রত হওয়ার কারণ না হয়, তাই তাহাদের পেছন দিয়া তওয়াফ করিতে বলিলেন। অধিকাংশ হাজী মক্কা ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় তখন ফজরের জমাতে যে

পরিমাণ লোক ছিল তাহাদের পেছন দিয়া উটের সাহায্যে তওয়াফ করা সহজ সাধ্যই ছিল। মসজিদের ভিতরে উট ইত্যাদি পশু নেওয়া বিশেষতঃ দীর্ঘ সময়ের জন্য নিষিদ্ধ; কারণ উহার মল-মূত্র ত্যাগের কোন ঠিক-ঠিকানা নাই—যাহাতে মসজিদ অপবিত্র হওয়ার প্রবল আশঙ্কা। কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোজেযারূপে তাঁহার উট নির্ভরযোগ্য ছিল যে, মসজিদে মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না, তাই হযরতের বিবি সেই উট মসজিদের ভিতরে নিয়া উহার উপর চড়িয়া তওয়াফ করিয়াছেন ৮৪২নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, স্বয়ং নবী (দঃ)ও বিশেষ কারণে স্বীয় উটের উপর চড়িয়া তওয়াফ করিয়াছেন।

সর্ব-সাধারণের জন্যও মাছআলাহ রহিয়াছে—অসুস্থতার দরুণ হাটিয়া তওয়াফ করিতে সক্ষম না হইলে পশু ভিন্ন অন্য কিছুতে চড়িয়া তওয়াফ আদায় করিতে পারে। বর্তমানে দেখিয়াছি—ছোট চৌকির ন্যায় তৈরী কাঠের উপর রুগ্ন-অচল ব্যক্তিকে বসাইয়া বা শোয়াইয়া ঐ কাঠ দুইজন শ্রমিক মাথায় বহন করতঃ তওয়াফ আদায় করাইয়া থাকে। ছাফা-মরওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে ছায়ী করার মছআলাহও রুগ্ন-অচলদের জন্য তদ্রূপই, বর্তমানে সে ক্ষেত্রে উক্তরূপ চৌকি ভিন্ন ছোট হাত গাড়ীও ব্যবহার করা হয় এবং এই কাজের জন্য অনেক শ্রমিক চৌকি বা গাড়ী নিয়া মোতায়েন থাকে।

মছআলাহ ঃ—তওয়াফ করা অবস্থায় কোন গর্হিত কাজ হইতে দেখিলে সে কাজে বাধা দিতে এবং উহা রহিতের ব্যবস্থা করিতে পারে। ৮৫০ হাদীছ

তওয়াফ ও উহার নামাযের বিভিন্ন মাছআলাহ

মছআলাহ ঃ—বিশিষ্ট তাবেয়ী আতা (রঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি তওয়াফ করিতেছে এমতাবস্থায় সাত চক্কর পূর্ণ হইবার পূর্বেই নামাযের জমাত আরম্ভ হইয়া গেল কিম্বা অন্য কোনও কারণে তওয়াফ কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইল; তখন সে ব্যক্তি নামাযান্তে বা বাধা মুক্তির পর অবশিষ্ট তওয়াফ ঐ স্থান হইতে পুনরারম্ভ করিবে যথা হইতে পরিত্যাগ করিয়াছে। ইবনে ওমর (রাঃ) ও আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) তাঁহারাও এইরূপ ফতোয়া দিয়াছেন।

মছআলাহ ঃ—প্রতি সাত চক্কর তওয়াফ পূর্ণ করার পর দুই রাকাত নামায পড়িবে। এমনকি, তওয়াফের সংলগ্ন কোনও ফরজ নামায পড়িলে তাহাতে ঐ তওয়াফের নামায আদায় হইবে না, বরং ভিন্নভাবে তওয়াফের জন্য দুই রাকাত ওয়াজেব নামায পড়িতে হইবে। (২২০)

মছআলাহ ঃ—মসজিদে-হরমের বাহিরে, এমনকি হরম শরীফের সীমার বাহিরেও যদি তওয়াফের দুই রাকাত নামায আদায় করে তবে জায়েয হইবে। কিন্তু এই দুই রাকাত নামায মকামে ইব্রাহীমকে সম্মুখে রাখিয়া পড়া উত্তম।

মছআলাহ ঃ—মক্কা শরীফে পৌঁছিয়াই অনতিবিলম্বে তওয়াফ করা কর্তব্য। যদি শুধু হজ্জের এহরাম থাকে তবে সেই তওয়াফ হইবে "তওয়াফে কুদুম" যাহা ছুন্নত, আর শুধু

ওমরার এহ্‌রাম থাকিলে সেই তওয়াফ হইবে ওমরার ফরজ তওয়াফ। আর হজ্জ ও ওমরা উভয়ের তথা হজ্জে-কেরাণের এহ্‌রাম থাকিলে প্রথমে ওমরার ফরজ তওয়াফ আদায় করা ওয়াজেব অতঃপর ওমরার সায়ী করিবে, তারপর হজ্জের ছুন্নত তয়াফে-কুদুম করিবে। তারপরেও যত সময় মক্কায় থাকিবে বেশী পরিমাণে নফল তওয়াফ করা উত্তম, এমনকি মক্কার বাহিরের লোকদের জন্য নফল নামায অপেক্ষাও নফল তওয়াফ অগ্রগণ্য। অবশ্য যদি নফল তওয়াফ না করে এবং শুধু ১০ তারিখে বা উহার পর ফরজ তওয়াফ—তওয়াফ-যেয়ারত করে তবুও গোনাহ্ হইবে না। হযরত (দঃ) বিদায়-হজ্জে নফল তওয়াফ করিয়াছিলেন না। হযরত (দঃ) হজ্জের মাত্র চার দিন পূর্বে মক্কায় পৌঁছিয়া ছিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে দ্বীনি প্রয়োজন অনেক ছিল। এতদ্ভিন্ন হযরতের সঙ্গে যে অসংখ্য লোকের কাফেলা ছিল—চার দিনের মধ্যে তাহাদের সকলের প্রাথমিক তওয়াফ আদায় করার অপরিহার্য্য প্রয়োজন ছিল, হয়ত সেই দিক লক্ষ্য করিয়াই হযরত (দঃ) নফল তওয়াফে যান নাই। কারণ, তাহা হইলে নফল তওয়াফকারীদের ভীড় অধিক হইয়া যাইবে।

(২২০ পৃষ্ঠা ৮০৮ হাদীছ)

মছআলাহ্ঃ—তওয়াফ অজুর সহিত করা কর্তব্য; অধিকাংশ ইমামগণের মতে অজু-বিহীন তওয়াফ শুদ্ধই হয় না।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জে মক্কায় পৌঁছিয়াই অজু করিয়া কা'বা শরীফের তওয়াফ করিয়াছিলেন। ৮৭৪ হাদীছ

হাজীদেরে পানি পান করাইবার খেদমত

৮৫৩। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জের সময় রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ) হযরতের নিকট অনুমতি চাহিলেন যে, হাজীদের পানি পান করানের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থানের নির্দিষ্ট ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ সমূহের রাত্রিবেলা আমি মক্কায় থাকিতে চাই। (হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানো তাঁহাদের বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য ছিল।) রসুলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহাকে সেই অনুমতি প্রদান করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—মিনা অবস্থানের তারিখসমূহে মিনাতে রাত্রি যাপন করা ওয়াজেব। কিন্তু হাজীদের পানি পান করানোর খেদমতে এতই ফজিলত যে, উহার জন্য আব্বাস (রাঃ) সেই ওয়াজেব হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

৮৫৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায়-হজ্জকালীন মক্কায়) হাজীদের জন্য বিশেষরূপে পানি পানের ব্যবস্থাপনার স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং পানি পানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন তাঁহার চাচা আব্বাস (রাঃ) স্বীয় পুত্র ফজলকে আদেশ করিলেন—তোমার মাতার নিকট হইতে রসুলুল্লাহ্

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য খাছ পানি নিয়া আস। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সর্ব-সাধারণের পানি হইতেই পান করান। আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এই পানির এবং এই পাত্রের মধ্যে সর্ব-সাধারণ সকলেই হাত ভিজাইয়া থাকে, আপনার জন্য বিশেষ পানির ব্যবস্থা করিতেছি। হযরত (দঃ) পুনরায় বলিলেন, সর্ব-সাধারণের জন্য প্রস্তুত পাত্র হইতেই আমাকে পান করান। হযরত (দঃ) সেই পাত্র হইতেই পানি পান করিয়া "যমযম" কূপের নিকটবর্তী আসিলেন। তথায় বহু লোক পানি পান করিতেছিল এবং কিছু সংখ্যক লোক পরিশ্রম করিয়া পানি পান করাইতেছিল। তাহাদিগকে নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা অতি উত্তম কাজ করিতেছ। তোমাদের উপর সকলের ভিড় হওয়ার আশঙ্কা না হইলে আমিও দড়ি লইয়া (যমযম কূপ হইতে পানি উত্তোলন পূর্বক) তোমাদের সঙ্গে পানি পান করানোর কার্যে যোগদান করিতাম।

যমযমের পানি দাঁড়াইয়া পান করা

৮৫৫। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিজে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে যমযমের পানি পান করাইয়াছি। তিনি উহা দাঁড়াইয়া পান করিয়াছেন।

ছাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী ছায়ী করা ওয়াজেব

৮৫৬। হাদীছঃ—ওরওয়াহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার খালা আয়েশা (রাঃ)কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি এই আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন? আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ○

অর্থ—নিশ্চয় ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দ্ধারিত একটি এবাদতের স্থান। যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ বা ওমরা করিবে, তাহার জন্য দূষণীয় হইবে না ঐ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে ছায়ী করা। (২ পাঃ ৩ রুঃ)

ওরওয়াহ (রঃ) বলেন, এই আয়াতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ছাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ছায়ী করা ওয়াজেব নহে, ঐ ছায়ী না করিলে গোনাহ হইবে না। নতুবা আল্লাহ তায়ালা এরূপ বলিতেন না যে, ছায়ী করা দূষণীয় নহে।

আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ যে, "ছায়ী না করিলে গোনাহ হইবে না" যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ তায়ালা এখানে এইরূপ বলিতেন—"দূষণীয় হইবে না ছায়ী না করা।" কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহা বলেন নাই।

অতঃপর আয়েশা (রাঃ) বলিলেন—(ছায়ী করা বস্তুতঃ ওয়াজেব কিন্তু) "ছায়ী করা দুষণীয় নহে" এখানে এই ধরণের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—ইসলামের পূর্বে অন্ধকার যুগে কাফেররাও নানারূপ গর্হিত ও কল্পিত নিয়মানুসারে হজ্জব্রত পালন করিয়া থাকিত। ঐ সময় মদীনাবাসী একদল লোক "কোদায়েদ" নামক স্থানের সম্মুখে "মোশাল্লাল" নামক একটি টিলার উপর প্রতিষ্ঠিত "মানাত" নামক একটি মূর্তিকে মা'বুদরূপে উপাসনা করিত। তাহারা ঐ মূর্তির উদ্দেশ্যে এবং উহার উপাসনারূপেই হজ্জব্রত পালন করিয়া থাকিত। তখন ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপরও দুইটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। মদীনাবাসীরা উক্ত মূর্তিদ্বয়কে মাবুদরূপে মান্য করিত না এবং উহাদের উপাসনাও করিত না। এই কারণে তাহারা ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী ছায়ী করাকে গোনাহ মনে করিত।

কালক্রমে মোসলমান হওয়ার পর তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিট জিজ্ঞাসা করিলেন—আমরা ত পূর্বে ছাফা-মারওয়ার ছায়ীকে গোনাহ ভাবিয়া উহা হইতে বিরত থাকিতাম, এখন আমাদের প্রতি কি আদেশ?

তাঁহাদের এই প্রশ্ন উপলক্ষেই উক্ত আয়াত নাযেল হয় এবং তাঁহাদের পূর্বেকার এই ভুল ধারণা যে, ছাফা-মারওয়ার ছায়ী গোনাহের কাজ—ইহা খণ্ডন করার পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হয় যে, ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করা দুষণীয় নহে। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক নির্দ্ধারিত ও নির্দেশিত একটি বিশেষ ধর্মীয় বিধান। সুতরাং কাহারও জন্য উহা হইতে বিরত থাকার অনুমতি নাই।

এতদ্ব্যতীত মদীনাবাসীদের বিপরীত আচরণকারী অন্য একদল লোকও উক্ত আয়াতের লক্ষ্যস্থল ছিল। তাহারা হইল মক্কাবাসী ও তাহাদের অনুসারীগণ। (ছাফা পাহাড়ের উপর "এছাফ" নামের একটি মূর্তি এবং মারওয়া পাহাড়ের উপর "নায়েলা" নামে অপর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্ধকার যুগে মক্কাবাসীরা ঐ মূর্তিদ্বয়ের পূজারী ছিল এবং ঐ মূর্তিদ্বয়ের উদ্দেশ্য ও উপাসনা রূপেই তাহারা ছাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী ছায়ী করিয়া থাকিত। তাহারাও মোসলমান হওয়ার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই মনোভাব ব্যক্ত করিল যে, আমরা পূর্বে একটি জঘন্য কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করিতাম। এখন আমরা মোসলমান হইয়া ঐ কাজ করাকে গোনাহ মনে করি।) এবং আল্লাহ তায়ালা কা'বা-ঘরের তওয়াফের আদেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন, ছাফা-মারওয়ার উল্লেখ করেন নাই (১৭ পাঃ ছুরা-হজ্জ ২৯ আয়াত দ্রষ্টব্য)। এমতাবস্থায় ছাফা-মারওয়ার ছায়ী কারায় গোনাহ হইবে কি? উক্ত দলের প্রশ্ন এবং মনোভাবকেও এই আয়াতের দ্বারা রদ করা হইয়াছে যে, হজ্জ বা ওমরার মাধ্যমে ছাফা-মারওয়ার ছায়ীকে গোনাহ মনে করা নিতান্ত ভুল ও অহেতুক। কারণ, হজ্জ বা ওমরা বস্তুতঃ একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতএব, উহার মাধ্যমে ছায়ীও আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইবে। সুতরাং উহা গোনাহ বা দুষণীয় হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—বিপরীত মতবাদের দুই দল লোকের ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব প্রসূত একই ভুল ধারণাকে রদ করতঃ প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপনার্থে এই আয়াতটি নাযেল হয়। আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতের মূল বিষয় বস্তু উল্লেখ করার পূর্বে অতি সুন্দর একটি ভূমিকার উল্লেখ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, বহু পূর্ব হইতে ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত বিশেষ এবাদতের স্থান। যাহারা কোন মূর্তির উদ্দেশ্য ও উপসনারূপে এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী ছায়ী করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় গোনাহ ও শেরেকী কাজ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই পাহাড়দ্বয়কে আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত এবাদতের স্থানরূপে আল্লার নির্দেশিত বিধান হিসাবে একমাত্র আল্লার এবাদৎ বন্দেগী উদ্দেশ্য করিয়া ছায়ী করা—ইহাই ছিল এই পাহাড়দ্বয়ের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। অবশ্য অন্ধকার যুগে নানাবিধ কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়াছিল। এখন তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া অন্ধকার যুগের কুসংস্কার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র হইয়াছ। অতএব, পূর্ব উদ্দেশ্য তথা আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত বিশেষত্বকে রূপায়িত করার মধ্যে এখন কি দোষ থাকিতে পারে? এবং যাহারা আন্ধকার যুগে নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকিয়া ছাফা-মারওয়ার ছায়ীকে গোনাহ মনে করিত তাহারাও এখন আর উহাকে গোনাহ মনে করিতে পারে না। কারণ, ইসলাম সমস্ত কুসংস্কারেরই মূলোৎপাটন করিয়া দিয়াছে। মূর্তি দুর করিয়া ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। গর্হিত মূর্তির কারণে মূল জিনিস নষ্ট হইবে না। মূল জিনিস আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এখনও তাহাই বলবৎ আছে এবং থাকিবে।

৮৫৭। হাদীছ ঃ— আমর ইবনে দীনার (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন ব্যক্তি ওমরার এহরাম বাঁধিয়াছে; অতঃপর ওমরার দুইটি কাজ তথা তওয়াফ ও ছায়ী হইতে শুধু বাইতুল্লার তওয়াফ করিয়াছে; ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করে নাই; সে এহরামের বিপরীত কাজ—স্ত্রী-ব্যবহার করিতে পারে কি? অর্থাৎ ছাফা-মারওয়ার ছায়ী ব্যতিরেকে তাহার ওমরা পূর্ণ হইয়াছে কি? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, নবী (দঃ) বিদায়-হজ্জকালে মক্কায় আসিয়া সাত চক্কর তওয়াফ করিয়াছেন এবং মকামে-ইব্রাহীমকে সম্মুখে রাখিয়া দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন এবং ছাফা-মারয়ার সাত ফেরা ছায়ী করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, "তোমাদের জন্য রসুলুল্লার কার্য্যাবলীতে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে।" অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) ছায়ী করিয়াছেন, সুতরাং সকল মোসলমানকে হজ্জ এবং ওমরায় ছায়ী অবশ্যই করিতে হইবে; উহা ব্যতিরেকে হজ্জ বা ওমরা সম্পন্ন হইবে না। অতএব ছায়ী করার পূর্বে এহরামের বিপরীত কাজ—স্ত্রী-ব্যবহার করিতে পারিবেনা।

আমর ইবনে দীনার (রঃ) আরও বলিয়াছেন যে, উক্ত বিষয়টি আমরা জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি সরাসরি স্পষ্টই বলিলেন—ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করার পূর্বে কিছুতেই স্ত্রী-ব্যবহার করিতে পারিবে না।

মছআল্লাহ্ঃ—হজ্জ এবং ওমরায় ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের ছায়ী করা একটি বিশেষ ওয়াজেব। ইহা আদায় না করা পর্য্যন্ত হজ্জ ওমরা পূর্ণ হইবে না। ইহার বিধানগত সময় হইল ওমরার তওয়াফের সঙ্গে এবং হজ্জের যে কোন তওয়াফের সঙ্গে করা। যদি ঐরূপ না করিয়া থাকে তবে পরে যে কোন সময় অবশ্যই আদায় করিবে, এমনকি যদি উহা না করিয়া এহরাম ভাঙ্গিয়াও ফেলিয়া থাকে তবুও উহা আদায় করিতে হইবে। অবশ্যই উহা জিম্মায় ওয়াজেব থাকিবে। এই ওয়াজেব আদায় করার জন্য পুনরায় তাহাকে হজ্জ বা ওমরার নিয়্যতে মক্কা শরীফে আসিয়া উহা আদায় করিতে হইবে। কিম্বা একটি কোরবানীর টাকা কাহারও হাতে মক্কা শরীফ পাঠাইতে হইবে এবং কাফ্ফারারূপে সেই কোরবানী হরম শরীফের সীমার ভিতর জবেহ করা হইলে উক্ত ওয়াজেব আদায় না করার বিনিময় আদায় হইয়া নিস্কৃতি লাভ হইবে।

৮ই জিলহাজ্জ জোহরের নামায কোথায় পড়িবে ?

৮৫৮। হাদীছঃ—আবদুল আজিজ ইবনে রোফায় (রঃ) আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ৮ই জিলহাজ্জ জোহর ও আছরের নামায কোথায় পড়িয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন—মিনায়। তৎপর জিজ্ঞাসা করিলেন, মিনা হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে আছরের নামায কোথায় পড়িয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, "আবতাহ্" নামক স্থানে। (যাহাকে "মোহাচ্ছাব" বলা হয়, যাহার বর্ণনা ৯০৫নং হাদীছে উল্লেখ আছে।) অতঃপর আনাছ (রাঃ) আরও একটি কথা বলিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য এই যে—এই বিবরণের অনুসরণ ছুন্নত বটে, কিন্তু উহা সুযোগ-সুবিধা সাপেক্ষ—ওয়াজেব বা ছুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ নহে।

মছআলাহ্ঃ—মক্কায় অবস্থানকারী ব্যক্তি ৮ই জিলহজ্জের পূর্বেও এহরাম বাঁধিতে পারে ; ৮ই জিলহাজ্জ এহরামের শেষ তারিখ। সে মক্কার সব স্থানেই এহরাম বাঁধিতে পারিবে। (১২৪ পৃঃ)

আরফায় অবস্থানের দিন রোযা না রাখা

৮৫৯। হাদীছঃ—উম্মুল-ফজল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আরফায় অবস্থানের দিন সকলের মনেই এই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রোযা রাখিয়াছেন কি-না ? (কারণ, সাধারনতঃ আরফার দিনের নফল রোযা অনেক ফজিলত রাখে।) তখন আমি প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য হযরতের নিকট পানীয়রূপে কিছু দুধ পাঠাইয়া দিলাম। হযরত (দঃ) পান করতঃ প্রকাশ করিয়া দিলেন—তিনি রোযা রাখেন নাই।

মছআলাহ্ঃ—আরফার দিন অর্থাৎ জিলহজ্জ চাঁদের নবম তারিখে রোযা রাখার অতিশয় ফজিলত ও ছওয়াব বর্ণিত আছে। কিন্তু যাহারা হজ্জ উপলক্ষে আরফার ময়দানে অবস্থানরত থাকিবে তাহারা ঐ রোযা রাখিবে না। আরফার ময়দানে বেশী বেশী দোয়া-এস্তেগফার ও জিকির-তছবীহ এবং নফল নামায ইত্যাদি এবাদৎ অধিক উত্তম ; রোযার দরুন উহা ব্যহত হইবে।

মিনা হইতে আরফায় যাওয়ার পথে

৮৬০। হাদীছ ঃ—এক ব্যক্তি আনাছ (রাঃ)কে মিনা হইতে আরফায় যাওয়াকালীন জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা এই দিন অর্থাত জিলহজ্জের নবম তারিখে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে থাকাকালীন কি কি কাজ করিতেন? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ লাব্বাইকা·····বলিতে থাকিত, তাহাতে বাধা দেওয়া হইত না এবং কেহ কেহ তকবীর-তশরীক বলিত, তাহাতেও বাধা দেওয়া হইত না।

আরফার ময়দানে

জিলহজ্জের ৯ তারিখে বেলা এক প্রহরের মধ্যেই সাধারণতঃ আরফার ময়দানে পৌঁছা হয়। আরফায় পৌঁছিয়াই দোয়া-দরূদ, জিকর, তলবিয়া এবং নফল নামায ইত্যাদিতে মশগুল থাকিবে; সময় মোটেই নষ্ট হইতে দিবে না।

জোহরের নামাযের পর হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পুর্ণ সময়টুকু আরফার দিনের বিশেষ সময় এবং গোটা হজ্জব্রতের বরকত ও মঙ্গল কুড়াইবার সময়, আল্লাহ তায়ালার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ করাইবার সময়, দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি ও সুখ-শান্তি এবং কল্যাণ আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে চাহিয়া লইবার সময়, কবরের আজাব, হাশরের কষ্ট, পোলছেরাতের বিপদ ও দোযখ হইতে উদ্ধারের এবং বেহেশত লাভের আবেদন-নিবেদন আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করার সময়। এই সময়টুকুকে ওকুফে-আরফাহ বা আরাফায় অবস্থানের সময় বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ আরফার ময়দানে আল্লার দরবারে কান্দাকাটা করা, তওবা-এস্তেগফার করা, দোয়ায় লিপ্ত হওয়া—যাহা আরফার ময়দানে অবস্থানের মুল উদ্দেশ্য—সেই উদ্দেশ্য সমাপন করার সময় ইহাই। এই উদ্দেশ্য সমাপনের সময়কে সুদীর্ঘ করার জন্য শরীয়তের বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ও মহুআলাহ বোখারা (রঃ) ২২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—(১) আরফার দিন জোহরের নামায শীঘ্র পড়িয়া নেওয়া। (২) জোহরের সঙ্গেই আছর নামাযও পড়িয়া নেওয়া (শর্ত সাপেক্ষ—বিবরণ সম্মুখে)। (৩) জোহর নামাযের পুর্বক্ষণে খলীফা বা তাঁহার প্রতিনিধির ভাষণ সংক্ষিপ্ত হওয়া। (৪) যথা সম্ভব সত্বর আরফায় অবস্থানের উপরোল্লিখিত মুল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা।

৮৬১। হাদীছ ঃ—সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ইতিহাস প্রসিদ্ধ কঠোর প্রকৃতির মানুষ মক্কার) গভর্ণর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে তাহার রাষ্ট্রপতি আবদুল মালেক আদেশ-নামা লিখিয়া পাঠাইলেন—গভর্ণর যেন হজ্জের সমুদয় ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর পরামর্শে চলেন; তাঁহার কথার বাহিরে না চলেন। তাই গভর্ণর হাজ্জাজ আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের নিকট আরফার ময়দানের কার্য্য সম্পাদনের নিয়ম জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

সালেম বলেন, সেমতে পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরফার দিন সূর্য্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করিতেই আমাকে সঙ্গে নিয়া হাজ্জাজের তাঁবুর নিকটবর্তী আসিয়া তাঁহাকে

ডাকিলেন। তিনি বাহিরে আসিলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, ছুন্নত আদায় করিতে চাহিলে এখনই জোহর নামাযের জন্য চলুন। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মুহূর্তে? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হাজ্জাজ বলিলেন, সামান্য অবকাশ দিন; সংক্ষিপ্ত গোসল করিয়াই আমি বাহির হইতেছি। আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় বাহন হইতে নামিলেন; ইতিমধ্যেই হাজ্জাজ বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমার ও আমার পিতা আবদুল্লাহর মধ্যে হাজ্জাজ—এই অবস্থায় আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি হাজ্জাজকে বলিলাম, আজিকার দিনের ছুন্নত তরীকা পালন করিতে চাহিলে ভাষণ সংক্ষিপ্ত করিবেন, জোহরের নামায অবিলম্বে যথা সম্ভব সত্বর পড়িবেন এবং আরফায় অবস্থানের মূল উদ্দেশ্য-কার্য্যে যথারীতি আত্মনিয়োগ করিবেন। আমার কথা শ্রবণে হাজ্জাজ পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের প্রতি তাকাইলেন। তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, সে ঠিকই বলিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন, আরফার দিন জোহরের আউয়াল ওয়াক্তে আছরের নামাযকেও জোহরের নামাযের সঙ্গে একত্রে পড়িয়া নেওয়ার রীতি মোসলমানগণ রসুলের আদর্শ মতে এই উদ্দেশ্যেই পালন করিয়া আসিতেছে। অর্থাৎ আরফায় অবস্থানের মূল উদ্দেশ্য-কার্য্যের সময়কে প্রশস্ত করার জন্য।

সালেমের শাগের্দ ইমাম জুহরী সালেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আরফার দিন জোহরের ওয়াক্তে আছর নামায পড়িয়া নেওয়া—ইহাকি স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) করিয়াছেন? সালেম বলিলেন, এইরূপ ব্যাপারে মোসলমানগণ একমাত্র রসুলের আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—পূর্বোল্লিখিত চারিটি বিষয়ের দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ আরফার দিন আছরের নামায জোহরের সঙ্গে পড়িয়া নেওয়া যাহার বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) করিয়াছেন উহা বিশেষ শর্ত সাপেক্ষ। আরফার ময়দানের মসজিদে-নামেরাতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার নিয়োজিত প্রতিনিধীর ইমামতীতে জমাতের সহিত জোহর নামায পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে আছরেরও জমাত পড়া হইবে। অন্য স্থানে নামায পড়া হইলে বা অন্য ইমামের জমাতে কিম্বা একা নামায পড়া হইলে সে ক্ষেত্রে জোহর নামাযের ওয়াক্তে আছর নামায শুদ্ধ হইবে না। আছর নামায উহার নিয়মিত ওয়াক্তেই পড়িতে হইবে। বর্তমান যুগেও আরফার দিন মসজিদে-নামেরায় জোহর নামায বাদশার প্রতিনিধির ইমামতীতে জমাতে হইয়া থাকে, কিন্তু তথায় যাইয়া জোহর নামায পড়া বাংলাদেশের লোকের ন্যায় দুর্বলদের জন্য অসম্ভব ও অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল দেখিয়াছি। আমাদের ন্যায় লোকদের জন্য নিজ নিজ তাবুতে জোহর আছর নামায নিয়মিত ওয়াক্তেই পড়িতে হইবে। অবশ্য দুপুরের প্রারম্ভেই গোসল করতঃ আউয়াল ওয়াক্তে জোহর পড়িয়া যথা শীঘ্র দোয়া-কালামে আত্মনিয়োগ করা চাই এবং আছরের ওয়াক্তে আছর নামায পড়িয়া পুনঃ দোয়া-কালামে রত হইয়া যথা সম্ভব অধিক সময় দোয়া-কালামে রত থাকা চাই। জীবনের এই অতি অসাধ্য সুযোগের এক মুহূর্তও অপব্যয় করা চাই না।

আরফার ময়দানে প্রত্যেক হাজীকেই অবস্থান করিতে হইবে

৮৬২। **হাদীছ ঃ**—ওরওয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অন্ধকার যুগের রীতি ছিল কোরায়েশ বংশের লোকগণ ছাড়া অন্য সকলেই উলঙ্গ হইয়া কা'বা শরীফ তওয়াফ করিত। কোরায়েশ বংশের লোকেরা অন্য লোকদেরকে কাপড় দিয়া সাহায্য করিত—পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে; ঐ কাপড় যাহারা পাইত তাহারা অবশ্য সেই কাপড় পরিয়া তওয়াফ করিত। যাহারা কোরায়েশদের হইতে কাপড় না পাইত তাহারা সকলে উলঙ্গ তওয়াফ করিত।

অন্ধকার যুগে কোরায়েশদের আরও বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সকল লোকই (জিলহজ্জের নয় তারিখে) আরফায় অবস্থান করিত এবং তথা হইতে ঐ দিন সন্ধ্যা বেলায় মোযদালেফার দিকে প্রত্যাবর্তন করিত, কিন্তু কোরায়েশরা আরফার ময়দানে মোটেই যাইত না, তাহারা মোযদালেফায়ই থাকিয়া যাইত এবং দশ তারিখ প্রভাতে তথা হইতে মিনায় প্রত্যাবর্তন করিত।

ওরওয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, কোরায়েশদের উক্ত গর্হিত কার্য্যের খণ্ডনেই পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযেল হইয়াছে—

ثم افيضوا من حيث افاض الناس "হে কোরায়েশরা! তোমরাও ঐ স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে যে স্থান হইতে অন্য সকল লোক প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে।" অর্থাৎ সকলে যেরূপ আরফায় পৌঁছিয়া তথা হইতে মোযদালেফায় প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে; তোমরাও আরফায় পৌঁছিয়া তথা হইতে নয় তারিখ সন্ধ্যায় মোযদালেফায় প্রত্যাবর্তন করিয়া দশ তারিখ ভোরে মিনায় প্রত্যাবর্তন করিবে।

৮৬৩। **হাদীছ ঃ**—জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) তাঁহার ইসলাম-পূর্ব ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইসলাম-পূর্বকালে একবার আমার একটি উট হারাইয়া গেলে উহার তালাশে আমি আরফার ময়দানে পৌঁছিয়া ছিলাম; তখন হজ্জের দিন। আমি দেখিলাম, নবী (দঃ) আরফায় অবস্থানরত; আমি ভাবিলাম, এই ব্যক্তিত কোরায়েশ বংশের—তিনি কেন এখানে আসিয়াছেন?

ব্যাখ্যা ঃ—নবী (দঃ) নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে অন্যান্যদের ন্যায় হজ্জ করিয়াছেন; তখনও তিনি এই সত্যটি পালন করিয়াছেন যে, কোরায়েশ বংশ সহ প্রত্যেক হাজী আরফার ময়দানে অবশ্যই যাইবে। নবুওতের পূর্বে নবী (দঃ) এই একটি সাধারণ ব্যাপারেও কাফেরদের গর্হিত নীতির বিরুদ্ধে সত্যকে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

আরফা হইতে মোযদালেফা যাত্রা

৮৬৪। **হাদীছ ঃ**—উসামা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জে আরফা হইতে মোযদালেফায় প্রত্যাবর্তনে কিরূপ চলনে চলিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, সাধারণ দ্রুত চলনে। আর পথ ফাঁকা পাইলে অধিক দ্রুত চলিয়াছেন;

আরফা-মোযদালেফার পথিমধ্যে প্রয়োজনে অবতরণ করা

৮৬৫। হাদীছ ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরফা হইতে মোযদালেফা যাওয়া কালে পথিমধ্যে পাহাড়ের সেই বাঁকে যাইতেন যথায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রস্রাব ত্যাগে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় যাইয়া প্রস্রাব করিতেন এবং অজু করিতেন, কিন্তু নামায পড়িতেন না; মগরেব নামায মোযদালেফায় পৌছিয়া পড়িতেন।

আরফা হইতে মোযদালেফার পথে শান্তি শৃঙ্খলার সহিত চলিবে

৮৬৬। হাদীছ ঃ— ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জে আরফা হইতে মোযদালেফায় আসার পথে তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। নবী (দঃ) পেছন দিকে উট দৌড়াইবার হাঁকাহাঁকি ও পিটাপিটির শব্দ শুনিতে পাইয়া চাবুক হস্তে ইশারা করতঃ লোকদিগকে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে আদেশ করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, হে লোক সকল! শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা তোমাদের বিশেষ কর্তব্য; উট দ্রুত হাঁকাইবার মধ্যে কোন ছওয়াব ও পুণ্য নাই।

মোযদালেফায় নামাযের সময়

মছআলাহ ঃ- সূর্য্যাস্তের পর আরফা হইতে মোযদালেফা যাওয়ার জন্য রওয়ানা হইতে হয় এবং মগরেবের নামাযের সাধারণ ওয়াক্ত হইয়া যায়, কিন্তু ঐ দিন মগরেবের নামাযের ওয়াক্ত মোযদালেফায় পৌঁছার পর এশার নামাযের সহিত একই সঙ্গে হইয়া থাকে। অতএব মগরেবের নামাযের নিয়মিত ওয়াক্তে অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের পরেই আরফার ময়দানে বা পথিমধ্যে মগরেবের নামায পড়িলে তাহা শুদ্ধ হইবে না। কারণ, এরূপ করিলে মগরেবের নামায ঐ দিনের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্তের পূর্বে পড়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। এ সম্পর্কে প্রথম খণ্ডের ১১০নং হাদীছ অতি সুস্পষ্ট, যাহা এখানেও উল্লেখ আছে।

৮৬৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোযদালেফায় মগরেব ও এশার নামাযদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন একামত দ্বারা একই ওয়াক্তে পড়িয়াছেন এবং উভয় নামাযের মধ্যবর্তী বা শেষে কোন (ছুন্নত বা নফল) নামায পড়েন নাই।

৮৬৮। হাদীছ ঃ—আবু আইউব আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জে (আরফার দিন) মগরেবের ও এশার নামাযদ্বয় একত্রে এশার সময়ে মোযদালেফায় পড়িয়াছেন।

মছআলাহ ঃ- মোযদালেফায় মগরেব ও এশার নামায একত্রে পড়িবে। এমনকি, অনাবশ্যক কোন কাজে লিপ্ত হইয়া উভয় নামাযের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিবে না এবং সেই ক্ষেত্রে উভয় নামাযের জন্য আজান একবারই দিতে হইবে। অবশ্য একামত ভিন্ন ভিন্ন বলিবে এবং মধ্যস্থলে কোনরূপ ছুন্নতও পড়া হইবে না।

মোযদালেফায় শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার প্রতি বিশেষ তৎপর হওয়া চাই। এমতাবস্থায় বেতের নামায ইত্যাদি শেষ রাত্রেই আদায় করিবে। এশার নামাযের পর নফল, বেতের ইত্যাদি নামাযে লিপ্ত হওয়ার আবশ্যক হয় না, বরং এশার নামাযান্তে যথা সম্ভব একটু আরাম করার ব্যবস্থা করিবে, যেন শেষ রাত্রে বিশেষরূপে তাহাজ্জুদ নামায, দোয়া, এস্তেগফার, তলবিয়া, তাকবীরে-তশরীক ইত্যাদি পড়া সহজসাধ্য হয় এবং বেতের নামাযও তখনই পড়িবে। এমনকি, ঐ অবস্থায় মুসাফির হওয়ার দরুণ মগরেব ও এশার ছুন্নত তখন ছুন্নতে-মোয়াক্কাদা থাকে না বলিয়া শেষ রাত্রে বেশী এবাদতের আশায় এশার নামাযের পর দ্রুত আরাম করার উদ্দেশ্যে ঐ ছুন্নত সঙ্গে সঙ্গে না পড়িলেও দোষ নাই।

কিন্তু শেষ রাত্রে উঠিয়া এবাদৎ করার ভরসা না থাকিলে মগরেব ও এশার ছুন্নত এশার ফরজের পরেই পড়িবে (অবশ্য উহা না পড়িলেও চলিবে) এবং তৎপর বেতের নামায পড়িবে।

৮৬৯। হাদীছ ঃ—আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) একবার হজ্জ করিলেন, আমরা তাহার সঙ্গে ছিলাম। আমরা আরফা হইতে মোযদালেফায় এমন সময় পৌঁছিলাম, যখন এশার নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এক ব্যক্তিকে আজান দিতে বলিলেন। সে আজান দিল, তৎপর একামত বলিল। তখন তিনি মগরেবের নামায পড়িলেন, তৎসঙ্গে দুই রাকাত ছুন্নতও পড়িলেন। অতঃপর খাওয়া-দাওয়া করিলেন। তৎপর পুনরায় এক ব্যক্তিকে আজান দিতে আদেশ করিলেন। সে ব্যক্তি আজান দিয়া একামত বলিল, তিনি এশার নামায (কছর) দুই রাকাত পড়িলেন।

রাত্রি শেষে ছোবেহ্-ছাদেক উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এমনকি কেহ বলিতেছিল, ছোবেহ্-ছাদেক উদিত হইয়াছে; কেহ বলিতেছিল, উদিত হয় নাই। (অর্থাৎ ফজরের নামাযের একেবারে আউয়াল ওয়াক্তে—যখন যথেষ্ট অন্ধকার থাকিয়া যায়,) তখন তিনি বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সাধারণতঃ ফজরের নামায এরূপ আউয়াল ওয়াক্তে পড়িতেন না, * কিন্তু এই দিন এই স্থানে ফজরের নামায এই সময়েই পড়িয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) অতঃপর বলিলেন, কেবলমাত্র এই মোযদালেফার মধ্যেই দুই ওয়াক্ত নামায নিয়মিত সাধারণ সময় হইতে ব্যতিক্রম করিয়া পড়া হয়। প্রথম—মগরেবের নামায; উহাকে উহার আসল ওয়াক্ত সূর্য্যাস্তের সংলগ্ন সময় হইতে সরাইয়া এশার নামাযের সময়ে পড়া হয়। দ্বিতীয়—ফজরের নামায; উহাকে সাধারণ মোস্তাহাব ওয়াক্ত তথা ছোবেহ্-ছাদেকের পর আলো আসার পূর্বে অন্ধকার থাকিতেই পড়া হয়। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি।

---

* কারণ ছোবেহ্-ছাদেক উদিত হওয়ার পর সূর্য্যোদয়ের পূর্বে অন্ধকার যাইয়া আলো আসিলে পর সাধারণতঃ ফজরের নামাযের মোস্তাহাব ওয়াক্ত হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) আরও বর্ণনা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এই স্থানে (অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে হাজীদের জন্য মোযদালেফায়) একই সময় দুইটি নামাযকে উহার নিয়মিত সাধারণ ওয়াক্ত হইতে সরানো হইয়াছে। মগরেবের নামায যাহা এশার সময় পড়া হয়; লোকগণ মোযদালেফায় এশার সময়ই পৌঁছিয়া থাকে। আর ফজরের নামায যাহা এই সময় (ছোবেহ-ছাদেক উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলো হইবার পূর্বে অন্ধকারের মধ্যে) পড়া হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ফজর নামাযান্তে "ওকুফ" করিলেন—অর্থাৎ মোযদালেফায় অবস্থানের মূল কার্য্য—নির্ধারিত সময় তথা ছোবেহ-ছাদেক উদিত হওয়ার পর দোয়া-এস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং পূর্ণরূপে আলো হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে রত রহিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমীরুল-মোমেনীন এখন (অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্বে) মিনা যাত্রা করিলে নিয়মিত ছুন্নত সঠিকরূপে পালনকারী হইবেন। তিনি যখন এই কথা বলিতে ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই—যেন উহারও পূর্বক্ষণে আমীরুল-মোমেনীন ওসমান (রাঃ) মিনার দিকে যাত্রা করিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ১০ তারিখে জামরা-আকাবায় কঙ্কর মারা পর্য্যন্ত তলবিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন।

মছআলাহ ঃ—মোযদালেফায় অবস্থানের ওয়াজেব আদায়ের নির্ধারিত সময় ছোবেহ-ছাদেক উদিত হওয়ার পর হইতে আরম্ভ হয় এবং ছোবেহ-ছাদেকের আলো পূর্ণতা লাভ করিলে, কিন্তু সূর্য্য উদিত হওয়ার পূর্বে মোযদালেফা হইতে মিনার দিকে যাত্রা করিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ যদি মোযদালেফায় মগরেব ও এশার নামাযদ্বয়ের মধ্যস্থলে কোন কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয় যদ্দরুণ মগরেবের নামায পড়ার পর এশার নামায পড়িতে কিছুটা বিলম্ব ঘটিবে, এমতাবস্থায় উভয় নামাযের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আজান একামত বলায় এবং মগরেবের ছুন্নত উহার ফরজের সংলগ্ন পড়ায় কোনও দোষ হইবে না!

মোযদালেফা হইতে মিনা রওয়ানা হওয়ার সময়

৮৭০। হাদীছ ঃ—আম্র ইবনে মায়মুন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার হজ্জের সময় আমি ওমর (রাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। আমি দেখিয়াছি, তিনি মোযদালেফায় আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ার পর অপেক্ষা করিলেন এবং বলিলেন, অন্ধকার যুগে কাফের-মোশরেকরা এই রীতিতে হজ্জ করিত যে, তাহারা মোযদালেফা হইতে মিনার দিকে সূর্য্য উদয়ের পূর্বে যাত্রা করিত না। তাহারা "ছবীর" নামক পাহাড়ের উপর সূর্য্যের কিরণ দৃষ্ট হওয়ার অপেক্ষায় থাকিত। কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রীতি তাহাদের রীতির বিপরীত ছিল। এই বলিয়া ওমর (রাঃ) সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই মোযদালেফা হইতে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। ২২৮ পঃ

৮৭১। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে (নারী এবং অল্প বয়স্ক ইত্যাদি দুর্বল লোকদের সঙ্গে) রাত্রি বেলায়ই মোযদালেফা হইতে মিনা পাঠাইয়াছিলেন।

৮৭২। **হাদীছ ঃ**—আসমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার খাদেম আবদুল্লাহ বর্ণনা করিয়াছেন, আসমা (রাঃ) মোযদালেফায় অবস্থান করাকালীন রাত্রে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে কি? আমি বলিলাম—না। তিনি পুনরায় নামায আরম্ভ করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে কি? আমি বলিলাম—হাঁ! তিনি বলিলেন, এখনই মিনার দিকে রওয়ানা হও। আমি তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিলাম এবং আমরা মিনায় পৌছিয়া "জাম্‌রা আকাবায়" কঙ্কর মারা সম্পন্ন করিলাম। অতঃপর তিনি তাঁবুতে আসিয়া ফজরের নামায পড়িলেন। আমি বলিলাম, আমার মনে হয় নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বেই আমরা মোযদালেফা হইতে আসিয়াছি এবং কংকর মারিয়াছি; তিনি বলিলেন, হে বৎস! রসুলুল্লাহ (দঃ) নারীদের জন্য এরূপ করার অনুমতি দান করিয়াছেন।

৮৭৩। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়-হজ্জে) আমরা মোযদালেফায় অবস্থানরত হইলে পর (হযরতের বিবি) ছওদা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—লোকজনের ভিড় হওয়ার পূর্বে রাত্রেই মোযদালেফা হইতে মিনায় চলিয়া আসার জন্য। কারণ, ছওদা (রাঃ) অপেক্ষাকৃত মোটা শরীর বিশিষ্টা ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন; তিনি ভিড়ের পূর্বে রাত্রেই চলিয়া আসিলেন। আমরা মোযদালেফায় থাকিলাম; ফজরের নামাযের পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আসিলাম। আমরা ভিড়ের দরুণ বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইলাম এবং উপলব্ধি করিলাম যে, আমিও যদি ছওদা (রাঃ)-এর ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করিতাম তবে আমার জন্য উত্তম ও শ্রেয়ঃ ছিল।

মছআলাহ ঃ—ওকুফে-মোযদালেফা ওয়াজেব এবং সেই ওয়াজেব আদায় হওয়ার জন্য নির্দ্ধারিত সময় হইল ছোবেহ-ছাদেক হইতে সূর্যোদয় পর্য্যন্ত। সমস্ত রাত্রি মোযদালেফায় অবস্থান করিয়া ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে তথা হইতে চলিয়া আসিলে সেই ওয়াজেব আদায় হইবে না। তাই ওয়াজেব আদায় করার জন্য হইলেও মোযদালেফায় অবস্থান করিতে হইবে। অতএব, ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে মোযদালেফা হইতে কিছুতেই আসা যাইবে না, অন্যথায় ওয়াজেব আদায় হইবে না। কিন্তু নারী, নাবালেগ, বৃদ্ধ, রোগী ইত্যাদি দুর্বল ব্যক্তিগণ ভিড় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মোযদালেফায় অবস্থান পূর্বক তথা হইতে ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে চলিয়া আসিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই কংকর মারার কাজ সম্পন্ন করিয়া লইলে তাহাদের জন্য ওয়াজেব আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য তাহাদের জন্যও সূর্য্যোদয়ের